খুবসুরত

খাজা আহমেদ আব্বাস

ভাষান্তর ঃ
সুবিমল বসাক

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৩৪৯ / জানুয়ারী ১৯৪২
প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই বিডন রো, কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ ঃ অনুপ রায়

কবি ধূর্জটি চন্দ

বন্ধুবরেষু

তানা-বানা

সকাল বেলায় দরজায় কেউ যেন ঘণ্টি বাজাল। খুলতেই দেখতে পেলাম তিনজন তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। একজন রোগা, ঢ্যাঙা তার পরনে সাদা সার্ট আর প্যাণ্ট, দুধের মত ধবধবে পরিষ্কার, দেখে ভ্রম হয় বুঝি এই মাত্র লণ্ড্রি থেকে এনে পাল্টেছে। দ্বিতীয় জন মাঝারি আকারের শ্যামবর্ণ, পরনে খাদির পাঞ্জাবী-পাজামা। তৃতীয় জনের বয়স অপেক্ষাকৃত কম। তার পরনের পোষাকগুলিও বিচিত্র ধরনের—পায়ে সাদা চটি, সিল্কের প্যাণ্ট, আর নায়লনের বুশসার্ট—যার গায়ে রঙ-বেরঙের পাখি, মুরগী, পেঁচা আঁকা আছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত—দিলীপকুমারের স্টাইল। মুখে পাউডারের হাল্কা প্রলেপ আছে বলে মনে হল।

চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'বলুন, আমি আপনাদের কী সেবা করতে পারি ?'

'আজ্ঞে, আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।' তারা অতঃপর জানাল যে মোমিনপুরের তাঁতচালক ও মিল-মজুররা মিলে একটা লাইব্রেরী স্থাপন করেছে, তাতে মোট সত্তরটা বই সংগৃহীত হয়েছে। আগামী মাসে এই লাইব্রেরীর শুভ উদ্বোধন করবেন প্রখ্যাত লেখক রাজেন্দ্র সিংহ বেদী, এবং সেই উপলক্ষে মুশায়রা-র [কবি-সম্মেলনের] আয়োজন করা হবে। আমি সানন্দে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

সাদা সার্ট-প্যাণ্ট পরিহিত যুবককে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কী করেন ?'

উত্তর এল, 'আমি একটা মিলের উইভিং মাস্টার।'

'আপনি ?' খাদির পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত যুবককে জিজ্ঞেস করলাম।

'আজ্ঞে, আমি মোমিনপুর তাঁত-চালকদের কো-অপারেটিভ সেক্রেটারী।'

অতঃপর আমেরিকান বুশসার্টকে সম্বোধিত করে এবার বললাম, 'আপনি কী করেন ?'

'আজ্ঞে, আমি কিছুই করি না—দিন কয়েক হল দেশ থেকে এসেছি—কাজ খুঁজছি।' তারপর কাজ সম্পর্কে যা আলোচনা করল, তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, সে যে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা কোনো মিল বা তাঁত কো-অপারেটিভে পাওয়া যাবে না।

তারা সবাই বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেল। মনে হল, আমেরিকান বুশসার্ট পরনে যুবকটি তাদের সঙ্গীদের কাছ থেকে পেছনে পড়ে থাকতে চায়। তারা দুজন সবে দরজার বাইরে গেছে, সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল, বলল, 'আপনার সঙ্গে একান্তে কয়েকটা কথা বলার আছে। আমি এদের সঙ্গে এসেছি কারণ আপনার বাড়ীর ঠিকানা আমার জানা ছিল না।'

'ব্যাপার কী?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'আজ্ঞে, মানে···ব্যাপারটা···আসলে কি জানেন···মানে ফিল্মে অভিনয় করার আমার খুব ইচ্ছে।'

এ ধরনের কথা প্রতিদিন যুবকদের মুখ থেকে শোনায় আমি অভ্যস্ত। বললাম, 'বেশ, এ তো আনন্দের কথা।'

'তাহলে আপনার ছবিতে কাজ পাবো তো?'

আমি জানালাম, 'না।'

'তাহলে অন্য কোথাও সুপারিশ করে দিন!'

'যথা?'

'রাজকাপুরের নামে একটা চিঠি দিন না।'

'রাজকাপুর তোমায় নেবে না।' আমি গম্ভীর মুখে তাকে বললাম।

'কেন?'

'তোমাকে দেখেই তার চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে, পাছে তার জায়গাটা তুমি অধিকার করে বসো।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন!'

আমি কথার গতি পাল্টাবার জন্য বললাম 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'ইউ পির ছোট এক গাঁ থেকে।'

'পড়াশুনা কতদূর?'

'ম্যাট্রিক অব্দি!'

'পাশ, না ফেল?'

কিছুক্ষণ থেমে উত্তর পেলাম, 'ফেল।' মনে হল তার বুশসার্টের গায়ে আঁকা পেঁচাগুলি চোখ মটকাচ্ছে।

'শোনো, এক কাজ করো, বাড়ি ফিরে যাও! বি-এ অব্দি পড়াশুনা করে এসো, তারপর আমি তোমার জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'অর্থাৎ, আপনি আমায় সাহায্য করবেন না।'

'কিছুটা তাই। বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা ম্যাট্রিক ফেল যুবকদের হিরো গড়ার কাজ আমি নিই নি।' একটু রুক্ষস্বরেই বললাম, যদিও এ-ধরনের সংলাপ প্রায় রোজই আওড়াতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। দিলীপকুমারের মত চুলগুলি কপালে এসে

আছড়ে পড়ল। মনে হল, পীড়াদায়ক রঙের বুশসার্টের সব পাখি, মুরগী, পেঁচা একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল।

'বেশ, ভাল কথা', সে নাটকীয় ঢঙে বলল। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবির তৃতীয় শ্রেণীর সহ-অভিনেতার মত সংলাপ বলল, 'এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়,—যাক্ তার জন্য কোনো চিন্তা নেই, অন্তত খোদা আমার সঙ্গে আছে, সাহেব।'

এ ধরনের সংলাপে আমি অভ্যস্ত। বললাম, 'আমার জানা নেই আল্লা মিঞা কোন ফিল্ম-কোম্পানী খুলছে।'

'আচ্ছা, এবার আমি যাচ্ছি—ভবিষ্যতে আমি বড় নায়ক হতে পারলে আপনার সঙ্গে তখনই দেখা করব।'

আমেরিকান বুশসার্ট-যুবক আমার পরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেল। নীল পাখি, সবুজ মুরগী আর গোলাপী পেঁচাও সেই সঙ্গে চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সেই যুবকটির সম্পর্কে ভাবলাম, মনে হল, ওর মধ্যে কিছু একটা বিশেষত্ব ছিল, যদিও অনেক ভেবে ঠিক করতে পারলাম না বিশেষত্বটা কী?

পরের মাসেই মোমিনপুরে লাইব্রেরী উদ্বোধন করতে গেলাম। ফেরার সময় একটা গলি ধরে আসছিলাম—প্রস্থে বড় জোর ছ'সাত ফুট। পথের ওপর অনেকে শুয়ে। যেন একটা খোলা-মেলা বেডরুম।

আমি হাতড়ে-হাতড়ে পা ফেলে গলি পার হচ্ছিলাম। মনে হল, কারো কাপড় আমার পায়ে জড়িয়ে পড়েছে। অতএব সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কাপড়টা তুলে মু্যনিসিপ্যালিটির হলদে বাতির আলোয় দেখতে পেলাম—সেই পরিচিত বুশসার্ট, কিন্তু তার কটা-উজ্জ্বল রং-বেরঙের পাখি, মুরগী, পেঁচা—দশদিনের ময়লা ও ঘামের দাগে সব ফিকে হয়ে গেছে। বিছানায় নজর পড়ল—একটা ছেঁড়া পুরনো ময়লা চাটাইয়ের ওপর, হাতখানি মুড়ে দিব্যি বালিশ করে সেই যুবকটি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার ময়লা গেঞ্জীর ফাঁকে রোগা-শীর্ণ বুকের হাড় ও পাঁজরগুলি দেখা যাচ্ছে। ধুলো-কাদা মাখা পাজামা হাঁটুর অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে, আর চটি জোড়া—সম্ভবত চুরি হবার ভয়ে ঘুমোবার সময়েও তার পায়ে পরা আছে, শুকতলা দুটোরই খয়ে গেছে। মনে হল, গেঞ্জীর ফাঁকে উঁকি মারা হাড়পাঁজরগুলি আমাকে কিছু বলতে চায়। এবারেও আমি নিরূপণ করতে পারলাম না কী বলছে। আমি নিঃশব্দে বুশসার্টখানি তার মাথার নিচে রেখে সেখান থেকে চলে এলাম।

*　　　　*　　　　*

দিন পনরো পরে একটা স্টুডিয়োয় যাবার সুযোগ ঘটলো। এক পরিচালক বন্ধু সেদিন সেখানে 'মব-সিন'-এর সুটিং করছিলেন। চলচ্চিত্র কোম্ভে মব-সিনের অর্থ, জনসমাকীর্ণ ভিড়; যার জন্য শত শত এক্সট্রার

প্রয়োজন পড়ে। পাঁচ টাকা রোজ দরে—যা থেকে সওয়া টাকা এক্সট্রাসাপ্লায়াররা কমিশন হিসেবে কেটে রাখে। এই জনসমুদ্রে পরিচিত একখানি মুখ দেখা গেল, তার পরনে বুশসার্টের পরিবর্তে স্টুডিয়ো থেকে দেয়া আধময়লা ধুতি ও দড়ি-বাঁধা ফতুয়া। আমাকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। পরে পরিচালকের সঙ্গে সিন তৈরী করার ব্যাপারে আলোচনা কালে ভাবলাম একটু সুপারিশ করে দিই, তাকে যেন এই দৃশ্যে কোনো সংলাপ দেওয়া হয়, তাহলে পৌনে চারটাকার জায়গায় সাড়ে সাতটাকা পাবে। কিন্তু তার নামটাও আমার জানা নেই, আমি এখনও তাকে আমেরিকান বুশসার্ট বলেই জানি।

এ ঘটনার দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, শুক্রবারে কেউ যেন দরজার ঘণ্টি খুব ধীরে শব্দ করল—যেন বোতাম টিপতে সঙ্কোচ বোধ করছে। দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম সেই যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে। তার অবস্থা আগের চেয়ে আরও খারাপ। চোখ জোড়া লাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো—সারা রাত বুঝি ঘুমোয় নি, গালজোড়া ভাঙা—কতদিন সে খাবার খায়নি, পরনের জামা-কাপড় ছেঁড়া-ময়লা, মুখে কয়েকদিনের দাড়ি গজানো। আমি তাকে ভিতরে ডেকে আনলাম, 'বসো।'

সে বলল, 'আমার সিনেমার নেশা ভেঙ্গে গেছে।'

'বেশ ভাল কথা—যদি তুমি বাড়ি ফিরে যেতে চাও, তাহলে আমি তোমায় ভাড়া দিতে পারি।'

'ধন্যবাদ! এই অবস্থায় আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই না। কারো কাছ থেকে ভাড়ার জন্য ভিক্ষেও চাই না—অন্য কোনো কাজ করতে চাই।'

তার গলার স্বর চাপা, অস্পষ্ট মৃতপ্রায়। ভাবলাম, হয়তো অনেক দিন ধরে সে উপোস করে আছে—বললাম, 'তুমি বসো, তোমার জন্য খাবার আনছি।'

পেছন থেকে তার ক্লান্ত স্বর ভেসে এল, যেন অপারগ বৃদ্ধ থেমে থেমে বলে চলেছে, 'আজ্ঞে, না মানে…আপনি…মিছিমিছি…কষ্ট…না' তারপর ধড়াম করে শব্দ, আমি বারান্দায় দৌড়ে এসে দেখলাম সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

সে রাতে আমি এই প্রথম ধৈর্যসহকারে তার সঙ্গে কথা বললাম।

'আগে বল, তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে, আমার নাম মোহম্মদ তাহির,' সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারায় বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়ল, 'কিন্তু বাড়িতে সবাই আমায় তানা বলে ডাকে।'

'হু, তাহলে প্রথম থেকেই তুমি তানাশাহ [ডিক্টেটার]?'

'আজ্ঞে না, সে 'তানার' তানা নয়—এ হল 'তানা-বানা'র তানা।

'তোমার বাড়ির লোকেরা কী করেন?'

'তানা-বানার কাজ অর্থাৎ কাপড় বোনেন। এখানে আসার আগেও আমি

স্কুলের সময় ছাড়া এ কাজই করতাম। আমার বা-জান এত মিহি সাড়ি বোনেন যে আপনাদের মেশিনে বোনা মখমলও লজ্জা পাবে।'

'তোমার বা-জান কার কাছ থেকে এ কাজ শিখেছেন?'

'তাঁর বা-জানের কাছ থেকে। সাত পুরুষ ধরে আমাদের বাড়তে মিহি সাড়ির তানা-বানা হতো। আমার ঠাকুর্দা মোহম্মদ বক্স তাঁতি ছিলেন। বাদশাহ শাহজহাঁর মেয়ে শাহজাদী জাহাঁআরা-র জন্য তনজেব, কিংখাব, গুলবদন ও গুলচমন বুনতো।' এই প্রথম তার চোখে আনন্দ ও উল্লাসের চমক দেখতে পেলাম।

'তোমাদের পরিবারের লোকেরা বুঝি আগে দিল্লীতে বাস করতেন?'

'আজ্ঞে না, আসলে আমাদের গাঁ শাহজাদী জাহাঁআরা স্থাপন করেছিলেন। তার জন্য নানান্ দেশ থেকে কুশলী ও চতুর কারিগর, দস্তকারীদের সেখানে এনে পাকাপাকি ভাবে বাস করলেন। আমার সেই বুড়ো-ঠাকুর্দাও এদের মধ্যেই ছিলেন।'

'তোমাদের গাঁয়ের নাম কী?'

'আগে এর নাম জহাঁ আবাদ ছিল—সে প্রায় এক যুগ আগে, এখন একে মহু বলে, মহুনাথ ভঞ্জন—উত্তর প্রদেশে আজমগড় জেলায় অবস্থিত।'

'মহুনাথ ভঞ্জন! নামটা কয়েকবার আওড়ালাম, 'বেশ বিচিত্র নাম তো!' তারপর তাদের গ্রাম-বসতি বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

শেষে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাপজান সুদক্ষ ও নামী কারিগর, তুমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছ কেন? ফিরে যেতেই বা চাইছ না কেন?

সে জানাল, 'মেশিনের কাপড়ের জন্য তাঁতের ব্যবসা মন্দা হয়ে গেছে। সারা মাসে অনেক কষ্টে বা-জান দু চারটে সাড়ির অর্ডার পায়।' বলেই সে থেমে পড়ল, যেন একমুহূর্ত ভাবল। বলি-বলি করে অতঃপর বলল, 'বা-জানের বয়স হয়েছে, বুড়ো হয়েছেন, শরীরে বাত হয়েছে, তাছাড়া সব সময় 'তানা-বানা'র ধাঁধায় পড়ে থাকেন।'

'তানা-বানা'র ধাঁধা? সে আবার কী?'

'আজীবন তাঁত চালিয়ে এসেছেন, তাই বলেন—এই পৃথিবীতে অন্য কোন কাজ নেই। শুধু তানা আর বানা। যদি শক্তির অধিকারী হতেন, তাহলে প্রমাণ করে দিতেন পৃথিবীর যাবতীয় রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রগতি, সব কিছু ঐ তানা-বানার খেলা।'

আমি বললাম, 'তোমার বা-জান এতটুকু ভুল বলেন নি তাহির মিঞা। আমার মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই এই তানা-বানার জীবনের প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। বৈজ্ঞানিকরা একেই নিগেটিভ-পজিটিভ-এর

নিয়ম বলে, আর মার্ক্সীয় ফিলজফি মতে থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিস।'

'তা হয়তো ঠিক, কিন্তু তিনি যে আমাকেও এই তানা-বানার ধাঁধায় জড়াতে চান—সেই জন্যই আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি!'

'অর্থাৎ তিনি চান তুমিও তার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ কর। এতে ক্ষতি কীসের?'

'না জনাব, কাজের ব্যাপারে নয়—তিনি চান আমিও এখন বিয়ে করি। তিনি বলেন, অবিবাহিত ছেলে শুধু 'তানা' হয়, যতক্ষণ না তার সঙ্গে 'বানা' যুক্ত হয়, জীবনের বুননও ঠিক মত হয় না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম: তাহলে তোমার জন্য তিনি কি 'বানা' খোঁজেন নি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই পালিয়ে এসেছি।'

'মেয়েটি কে?'

'আমাদের প্রতিবেশী চাচা রহমতের মেয়ে। বানু। কিন্তু আমায় ঠাট্টা করার জন্য 'বানু'র পরিবর্তে 'বানা' বলে ডাকে।'

আমি সশব্দে হেসে উঠলাম, 'তানা-বানা! তানা-বানা! বাঃ ভাবনাটা বেশ সুন্দর তো—কিন্তু তুমি এ বিয়ের বিরুদ্ধে কেন, মেয়েটি কি সাংঘাতিক নাকি?'

'না-না' সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'মেয়েটি বেশ ভাল, মুখের গড়ন-টড়নও খারাপ নয়। কিছুদূর লেখাপড়াও শিখেছে—কিন্তু স্যার, আপনি ভেবে দেখুন, বাড়িতে ভাল করে খাওয়া জোটে না—এমন অবস্থায় সেই বেচারীকে এনে অসুবিধেয় জড়ানোটা কি ভাল? তাই বোম্বাইয়ে এসেছি, যদি কোন কাজটাজ পাই।'

যে ভঙ্গিতে সে 'সেই বেচারী' বলল এবং 'বানু'র নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জোড়ায় যে আলো ফুটে উঠল, আমার সন্দেহ এবার ধ্রুব বিশ্বাসে পরিণত হল। আমি শুধোলাম, 'সত্যি করে বলোতো, তুমি তাকে ভালবাস, তাই না?'

সে মাথা নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানাল, কিন্তু কথার গতি পাল্টাবার জন্য দ্রুত ভাবে বলল, 'তাহলে আপনি তাঁতিদের কো-অপারেটিভে চিঠি লিখে দিন?'

তারপর বহুদিন তার সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। লোকেদের মুখে তার খবর পেতাম—তাঁতিদের কো-অপারেটিভে সে খুব মন দিয়ে কাজ করছে। তাদের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাহিরের কাজের প্রশংসা করল, সঙ্গে সঙ্গে আমায় ধন্যবাদ জানাল, এত সুদক্ষ কর্মী তাকে দিয়েছি বলে। তারপর শুনলাম, অবকাশের সময়ে সে বোম্বাইয়ের কোন আর্টিস্টের কাছ থেকে ড্রইং-এর কাজ শিখছে, এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলি নতুন ডিজাইন

মোমিনপুর কো-অপারেটিভে প্রচলিত হয়েছে। এও শুনলাম, সে নাকি কিছু পয়সাও জমিয়েছে। তবুও সে বাড়ি ফিরছেনা জেনে এক ধরনের দুশ্চিন্তা ও অবিশ্বাস মনে বাসা বাঁধল।

হঠাৎ একদিন সে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল, দুধের মত শ্বেত-শুভ্র বস্ত্র পরনে—একটা ট্যাক্সি চেপে। লক্ষ্য করলাম, ট্যাক্সির পেছনে একটা বাক্স, বিছানা বাঁধা।

বলল 'আমি মহু ফিরে যাচ্ছি। আপনাকে 'খোদা হাফিজ' জানাতে এলাম। আর আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তার ধন্যবাদ জানাতে।'

আমি বললাম, 'এমন কি ঘটল, হঠাৎ উঠে-পড়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেলে?'

সে বলল, 'মানে, চাচা রহমত আলির খত এসেছে···বানুর পাকাপাকি সম্পর্কে।'

আমি আশ্চর্যান্বিত হবার চেষ্টা করি, 'বল কি, বানুর পাকা-পাকির খত এসেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কাউকে দিয়ে লিখে পাঠিয়েছে। লিখেছে,—'তুমি যদি এখনও বানুর সঙ্গে বিয়ে করতে চাও, তাহলে তাড়াতাড়ি চলে এস, নইলে আমি ওর বিয়ে অন্য কারো সঙ্গে দেব।'—আপনি আমাদের ওখানে—মহুনাথ ভঞ্জনে একবার অবশ্যই আসবেন।'

যদি সুবিধে পাই, তাহলে যাবোখন। অবশ্য তোমাদের গাঁয়ের ঐ জবড়জঙ নাম যদি মনে থাকে।'

'আচ্ছা, তাহলে অনেক ধন্যবাদ। খোদা হাফিজ।'

'খোদা হাফিজ।'

ট্যাক্সি ছাড়ল। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধুলোর মাঝে তাকে অদৃশ্য হতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বচ্ছ চিন্তা আমায় কাতর করল। মাঝখানে জুড়ে বসে এই কাহিনীর সমাপ্তিটা যেন ভুল না হয়। আসলে, তাহিরের চাচা রহমত আলির তরফ থেকে যে খতখানা এসেছে—তা আমারই লেখা।

*　　　*　　　*

কয়েক মাস পরে সৈয়দ সজ্জাদ জহীর সাহেবের চিঠি এল, উত্তর প্রদেশে কতকগুলি স্থানে মুশায়রা ও লেখক-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

জানালাম: ক্ষমা করবেন। অনেক কাজ হাতে জমে আছে। বোম্বাই ত্যাগ করা এ সময়ে অসম্ভব।

সে নিজেই এসে হাজির। আবার জানালাম—আমায় ক্ষমা করবেন। একেবারে নিরুপায়।

সে বলল, 'আর কোথাও না যাও, অন্তত মহুতে চলো—সেখানে কৃষকদের

কনফারেন্স আছে।'

'মহুনাথ ভঞ্জন।' আমার কানে তাহিরের কণ্ঠ গুঞ্জন করে উঠল, 'আপনি আমাদের ওখানে একবার অবশ্যই আসবেন। মহুনাথ ভঞ্জন।'

আমি রাজী হলাম—আমার নিজের কাহিনীর সমাপ্তির খোঁজে। তাহিরের সঙ্গে স্টেশনেই দেখা হল, সেখান থেকে সরাসরি আমায় তার বাড়িতে নিয়ে গেল। দেখলাম, তাদের বাড়ির তাঁতে অপূর্ব সুন্দর এক ডিজাইনের সাড়ি বোনা হচ্ছে—সোনালী তানা আর চাঁদির বানা যতই বুনোন এগুচ্ছে ফুলগুলি ক্রমশ ফুটে উঠছে।

তার বা-জানের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম। আপনার 'তানা-বানা' ফিলজফির কথা তাহিরের মুখে শুনেছি এবং এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

শ্বেতশুভ্র পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে মিঞা বলল, 'তুমি এখানে এসেছ—সুদূর বোম্বাই থেকে মহুনাথ ভঞ্জন! এও একটা ভাগ্যের খেলা। এখানে কৃষকদের কনফারেন্স হচ্ছে। বলছিলাম, তানা হচ্ছে পরিশ্রমের আর বানা হল...'

'ভালবাসার।' আমি তার বাক্য শেষ করলাম।

তাহির ভিতরে ডাক দিল—'বানু, এদিকে এসো—বা-জান ডাকছেন। উহুঁ এঁর কাছে পর্দা করার কোন দরকার নেই।'

ধীরে চিক সরে গেল, এবং ভেতর থেকে বানু ঘরে প্রবেশ করল। লজ্জায় ঘোমটা টানা, চোখ দুটি আনত—ঝুঁকে আমায় সেলাম জানাল। আমি তাদের দুজনকে অনেক কিছু বলতে চেয়েছিলাম—ভালবাসার সম্পর্কে, তাদের ঐতিহাসিক শহরের সম্পর্কে, এই স্থানের সম্পর্কে—যুগ-যুগান্তর ধরে যেখানকার পরিশ্রমী তাঁতিরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাপড়ে নক্সার ফুল-ফল ফুটিয়ে তুলেছে, এই গাঁয়ের সম্পর্কে—যেখানকার বাসিন্দারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বদা এগিয়ে আসতো। আমি বলতে চেয়েছিলাম, পরিশ্রম ও ভালবাসার তানা-বানায় সর্বদা জীবনের সৌন্দর্য ও স্বাধীনতার প্রগতি সৃষ্টি হয়। এই তাঁত চিরদিন চলে এসেছে এবং চিরদিন চলবে।

কিন্তু কিছুই বলতে পারলাম না। মুখ দিয়ে শুধু দুটি সংক্ষিপ্ত শব্দ বের হল 'তানা-বানা।'

হাতের ময়লা

প্যারিসের কাফেতে পথের ধারে লোকেরা বসে যেমন আঙুরের মদ খায়, বোম্বাইয়ে প্যারিসিয়ান ডেয়ারীতেও ঠিক তেমনি একটা পরিবেশ। সেখানেও চেয়ার বিছানো রয়েছে, তবে মদ্যপান নিরোধ আইনের দরুণ হুইস্কী, ব্র্যান্ডী, শ্যাম্পেন কিংবা বিয়ার চলে না—শুধু কফি বা চায়ের পেয়ালা শূন্য করা চলে।

কয়েক বছর ধরে আমার সান্ধ্য প্রোগ্রাম মত ঠিক ছটার সময় প্যারিসিয়ান ডেয়ারীতে পেঁছে যাই, আর বসার জন্য এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করি যেখানে সমুদ্রের সুস্নিগ্ধ বাতাস এবং সেই সঙ্গে মেরিন ড্রাইভে সান্ধ্য ভ্রমণ-বিলাসী মেয়েদের চলমান দৃশ্য—দুটোর আনন্দ যুগপৎ গ্রহণ করা চলে। প্রথমে আমি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চেয়ে পাঠাই—তারপর কফির অর্ডার দিই। সান্ধ্য পত্রিকা বের করে সামনে তুলে ধরি, যাতে তার আড়ালে অন্যান্য সিটে বসা মেয়েদের দেহভঙ্গীমা উপভোগ করতে পারি। পত্রিকায় কোন উপাদেয় খবর থাকলে, তাও পড়ে শেষ করে ফেলি। সাড়ে ছটা অব্দি খুব ধীরে ধীরে আমেজ করে কফিতে চুমুক দিতে থাকি। তারপর গম্ভীর গলায় রোয়াব দেখিয়ে 'বয়' ডাক দিয়ে ওয়েটারকে 'বিল' আনতে বলি। ওয়েটার এলে তার ট্রে থেকে অতি সন্তর্পণে বিলটা তুলে নিই। যদিও জানি, প্যারিসিয়ান ডেয়ারীতে কফির দাম বারো আনা মাত্র, রোজ-রোজ এর দাম কম-বেশী হয় না, তবুও আমি চশমা তুলে মনোযোগ সহকারে দেখি। তারপর পকেট থেকে একখানা একটাকার নোট বের করে ট্রের ওপর এমন ভঙ্গীমা করে ফেলি যেন ওটা একটাকা নয়—একশ টাকার নোট। অতঃপর কিছুক্ষণ ওয়েটারের ফিরে আসার প্রতীক্ষা। বিলের ওপর পেইড স্ট্যাম্প লাগিয়ে ফিরে এলে, ট্রে থেকে বিল তুলে নিই, সিকিটা ট্রেতেই পড়ে থাকে এবং ওয়েটারকে অতঃপর এমন দৃষ্টি তুলে দেখি যেন আমি হাতেম তাইয়ের ছেলে আর সে হোল আলীবাবার গাধা। সে তৎক্ষণাৎ একটা স্যালুট দিয়ে বলে 'সেলাম হুজুর' আর আমি তখন লক্কা কবুতরের মত বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসি।

তারপর আমি বেনারসী পানের দোকানে এসে দাঁড়াই। ওকে আমার স্পেশাল মগাই পান সাজার অর্ডার দিই। যতক্ষণ সে পান সাজে, আমি সরে এসে পালিশওয়ালা ছোকরাকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নিই। দশ নয়া পয়সার জায়গায় ওকে একটা দু আনি অর্থাৎ বারো নয়া পয়সা দিই। এরি

মধ্যে পান সাজা হয়ে যায়। মগাই পান মুখে ফেলার সঙ্গে আইস ক্রীমের মত মিশে যায়, আর কেওড়ার সৌরভে আমার সমস্ত মন-মস্তিষ্ক একেবারে সুগন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে। পানওয়ালার থালায় আমি উপেক্ষা ভঙ্গীতে একটা সিকি ছুঁড়ে ফেলি এবং পেতলের থালার উপরে আঘাত পেয়ে যে মৃদু ঝঙ্কার তোলে, সেই শব্দ আমার কানে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর সংগীতের রূপ নিয়ে গুঞ্জরিত হতে থাকে। আমার সমস্ত শিরা-উপশিরা সেই মিষ্টি মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে, যেন কোন গুণী শিল্পী সেতারের তারে অঙ্গুলি পরশ করে বসেছে।

এরপর আমি মেরিন ড্রাইভে বেড়াবার জন্য এগোই। সম্মুখে সমুদ্রে অস্তমিত সূর্যকে দেখে মনে হয় একটা সোনার উজ্জ্বল মোহর যেন এক নীল ভেলভেট ব্যাগে রাখা হচ্ছে। (আমার চিন্তাধারা খুবই কবিত্বময় বলে আপনার অনুমান হতে পারে। কিন্তু কেন জানি, যত উপমা মনে আসে, তা শুধু টাকা-পয়সা, সোনা-চাঁদীকে কেন্দ্র করেই। কারণ, টাকা-পয়সাকে আমি স্রেফ হাতের ময়লা ভাবি)। হ্যাঁ, এ-সময় সূর্যাস্তের দৃশ্য খুবই সুন্দর উপভোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু আমি তাদের দলে নই, যারা সমুদ্রের ধারে চেয়ারে বসে বোকার মত একদৃষ্টে সূর্যাস্ত ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়। ধরে নিলাম, প্রকৃতি সুন্দর,—কিন্তু মনুষ্যজীবনে আরও কত সুন্দর সুন্দব বস্তু আছে—রং বেরংয়ের শাড়ি, ক্রমাগত সারি বেঁধে সমস্ত বিকেলটা মেরিন ড্রাইভ হয়ে পাশ করে। কালো গাড়ি, লাল গাড়ি, সবুজ, নীল, হলদে, দুরঙা মোটর গাড়িও। কোনটা মাছের মত সুন্দর ঢেউ খেলানো, আবার কোনটা উড্ডীয়মান পাখির পাখা বিস্তার করা। কোনটা এত ছোট ও পাতলা, যেন ছোট একটা মাছ ট্রাফিকের স্রোতে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে। আর আমি,—যে মোটর কোম্পানীতে কাজ করি, সেখানে শুধু ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে। এগুলি দেখে মনে মনেই হিসেব কষতে থাকি—এটা ফিয়েট, এর দাম বারো হাজার; এটা হিন্দুস্তান অ্যাম্বাসাডার চোদ্দ হাজারের; এটা জার্মানী মেড মার্সিডিজ—যে কোন বিদেশী দূতাবাস থেকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে কেনা চলে, দাম প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার, এ হোল আশি হাজার টাকার বড় শেভ্রলে ইম্পালা, যা শুধু ছোটখাট ফিল্মস্টার এবং বড় পুঁজিপতিরাই কিনতে পারে।

এভাবে আসাযাওয়া পথের মেয়েদের সম্পর্কেও মনে মনে হিসেব কষি—এই যে জীন পরিহিতা ছাঁটা চুলের মেয়ে, ছোট্ট একটা কুকুর নিয়ে বেড়াচ্ছে, কোন আমেরিকান তেল কোম্পানীর অফিসারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—যার মাইনে হয়তো কমপক্ষেও মাসিক তিন হাজার টাকা। এই যে পাশে বই গুঁজে চোখে চশমা এঁটে সতেরো টাকার ভয়েলের শাড়ি আর চটি পরে হলদেটে, রোগা মেয়েটি আসছে—হয়তো কোন কবি বা লেখকের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করে

বসবে—তারপর আমরণ শুধু অনুতাপ করবে। ঐ যে ছোট্ট ঘেরা শালোয়ার এবং ফ্রকের মত চাপা কামীজ পরনে লিপস্টিক মাখা একটা চলমান বিজ্ঞাপন হয়ে এগিয়ে আসছে, হয় সে ফিল্মস্টার হবে, নয়তো কোন বড় ব্যবসায়ীর কনিষ্ঠতম, অকর্মা ছেলের সঙ্গে বিয়ে করে বসবে।

সেদিন যখন সমুদ্রের ধারে বসে আমি এভাবে মেরিন ড্রাইভের পথে আসা যাওয়া মোটর গাড়ি এবং মেয়েদের জরীপনিকেশ করছিলাম, এমন সময় আমার কানে একটা শব্দ ভেসে এল, যা আমার সমস্ত 'মুড'টাকে একেবারে নষ্ট করে দিল।

বাবু, দেড়টা টাকা দাও। বাবু, ভগবান ভাল করবেন।

প্রশ্নকারিণীব উপব পরখ করা দৃষ্টি তুলে দেখলাম,—বিশ-বাইশ বছরের শ্যামবর্ণ চেহারা, পরনে আধময়লা শাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজের ফাঁকে যৌবন পরিস্ফুটিত। একজোড়া পুরু ঠোঁটে লিপস্টিকের পরিবর্তে শুষ্কতা। নগ্ন পা জোড়া ধূলিমলিন। ভিখারিণীকে দেখে মনে হলো—আহা বেচারী।

পৃথিবীর কারো ওপর আমার যদি কোন ঘৃণা থাকে—তা হলো এসব ভিখিরীদের। এরা আমাদের দেশের কলঙ্ক। অকর্মার ধাড়ী সব। ভদ্রলোকের কোমল মনে প্রবেশ করে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে। এক-একটি পয়সা সঞ্চয় করে হাজার হাজার টাকা জমায়। জেনেশুনে হাত পা ভেঙ্গে বিকৃত করে তোলে—যাতে ভিক্ষে করতে সুবিধে হয়। পথের ধারে বসে কুষ্ঠ আর ঘা-এর প্রদর্শনী খুলে বসে। বিদেশী টুরিস্টদের সামনে হাত প্রসারিত করে দেশের দুর্নাম করে। এ-সব ভিখিরীদের দেখলে শুধু ঘৃণাই জাগে না, বরং এদের প্রতি তীব্র বিরক্তী বোধ হয়। আমার হাতে শাসন থাকলে, আমি এদের গুলী করে শেষ করে দিতাম।

ভিখিরীদের মধ্যে যদি অপছন্দের তারতম্য থাকে তা হলো এই সব ভিখারিণীদের প্রতি। এরা শুধু ফাঁকিবাজ, অকর্মা, নির্লজ্জই নয়; বদচলন এবং বেহায়াও। বেহায়ার মত এরা ভদ্রলোকেদের চোখে চোখ রেখে পয়সা চায়। কেউ আবার ভাড়াকরা বাচ্চা কোলে করে দুধের জন্য পয়সা চেয়ে বেড়ায়, কেউ আবার সহায়হীন, নিঃসম্বল শরণার্থী হবার পাকা অভিনয় করে, আবার কেউ ভিক্ষে করার অন্তরালে বাজারে ঘুরে ঘুরে নিজের দেহের বেচাকেনা করে।

এই জন্য জীবনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভিখারী হোক আর ভিখারিণীই হোক কাউকে ভিক্ষে দিই না। প্যারিসিয়ান ডেয়ারীর ওয়েটারকে বরং চার আনা টিপস্ দিতে পারি, পালিশওয়ালা ছোকরাকে দু' নয়া পয়সা বখশিস্ দিই, কিংবা পানওয়ালাকে পনরো পয়সার জায়গায় সিকি দিই, কিন্তু কোন ভিখিরীকে একটা পয়সা দেওয়াও পাপ মনে করি। যদিও জানি, পয়সা আমার

হাতের ময়লা, কিন্তু সব সময়, সব জায়গায় হাত ধোয়াটাও পছন্দ করি না।

এক আনা নয়, দু আনাও নয়, ভিখারিণীটা যখন পুরো দেড় টাকা চেয়ে বসল, আমি আশ্চর্য হয়ে তাকালাম। মনে মনে ভাবলাম, এসব ভিখিরীরাও তাদের দর বাড়িয়ে ফেলেছে।

রুক্ষ ব্যঙ্গ-স্বরে বললাম—দেড় টাকা চাই···দেড় টাকা কেন, দুটো টাকা চাইলেই তো পারতে ?

সে জবাব দিল। অন্য ভিখারিণীদের মত চোখে চোখ রেখে নয়, বরং দৃষ্টি আনত করে, 'বাবার জন্য মদ নিয়ে যেতে হবে।'

আমি অবাক হলাম। ভাবলাম, এ ভিখারিণীটা একেবারে পাকা অভিনেত্রী। বা কি সুন্দর অভিনয়, কি সুন্দর সংলাপ মনে করেছে : বাবার জন্য মদ নিয়ে যেতে হবে। কে এমন ভদ্র ও কোমলমনা তাকে দূরে সরিয়ে দেবে। দু চার ঘণ্টার মধ্যে কত দেড়টাকা জমে উঠবে। দেখতে শুনতে মোটেই মন্দ নয়। অনেকে এমন আছে, শুধু মাত্র এর সঙ্গে দেড় মিনিট কথা বলার জন্য দেড় টাকা ফেলে দেবে। কে জানে, কথা বলতে বলতে কোন শৌখিন লোক হয়তো ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবে। কিন্তু এ সব ভিখারিণীরা জানে না, আমি ওদের দলে নই—যারা বোকার মত বেশ্যা কিংবা ভিখারিণীদের কাছ থেকে শুধু রোগ-ব্যাধি ক্রয় করে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও আমি অবিবাহিত। তবুও আমি এসব নষ্ট, নোংরা এবং বিষাক্ত সর্পিনীদের ধারে কাছে যাই না। সারাদিন অফিসে কাজ করি। অনেক রাত অব্দি মেরিন ড্রাইভে ঘুরে বেড়াই। ঘরে ফিরে খাবার খাই, তারপর খাটে শুয়ে লাইব্রেরী থেকে আনা সাধারণ নভেল পড়ি কিংবা কবারী'র কাছ থেকে চার আনা সিরিজের কিনে আনা কোন সচিত্র পত্রিকা, বইয়ের ছবি দেখতে দেখতে শুয়ে পড়ি। ভাল লাগে মসৃণ কাগজের বিদেশী পত্রিকাগুলি, প্রায় নিরাবরণ সুন্দরী মেয়েদের ছবি থাকে। রঙীন ছবির মানে গৌর গোলাপী শরীরগুলি ফলওয়ালার দোকানে আপেল, কমলালেবু, নাশপাতি ও আনারসের কথা মনে করিয়ে দেয়—তাজা রসসমৃদ্ধ, দেখা মাত্রই মুখ বেয়ে রস উঠে আসে, না খেয়েই উপোসী-পেট ভরে ওঠে।

আমি ওকে রুক্ষ স্বরে তাড়িয়ে দিলাম—যা যা নিজের পথ দ্যাখ। অন্য কাউকে এসব ঢঙ দেখাস্ গিয়ে। দশ বছর ধরে বোম্বাইতে আছি। এমন নাটক ঢের দেখেছি। যা।

সে শুধু এক পলক বিষণ্ণ ডাগর চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকাল। ওষ্ঠ জোড়া কিছু বলার জন্য কাঁপল, কিন্তু না বলেই চুপ করল। আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে সে অনতিদূরে লাইট পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কেন জানি, আমি সেখানেই বসে রইলাম আর বাঁকা চোখে ওর

লক্ষ্য রাখলাম। হয়তো মেয়েটার ঢঙ সম্পর্কে আমি খুব শিগগিরই প্রমাণ পাব।

সে দাঁড়িয়েছিল। মাঝ বয়েসী একটা লোক তার কাছে এগিয়ে গেল। এত দূর থেকে পথের আলোয় ওর চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু মাথায় তেল জব-জবে চুল, গলায় বাঁধা রুমাল, কানে গোঁজা বিড়ি এবং বিচিত্র চলন—যা উচ্চ স্বরে কাজের প্রমাণ দিচ্ছিল।

মেয়েটিকে সে ধীর স্বরে কিছু বোঝাচ্ছিল—যা শুনতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু তার বক্তব্য ভাল করেই বুঝতে পারছিলাম। জবাবে মেয়েটি মাথা নেড়ে অস্বীকার করছিল। দালালটা কথা বলতে বলতে তার কাঁধে হাত রাখল, মেয়েটি তৎক্ষণাৎ হাত ছাড়িয়ে দূরত্ব বজায় রেখে সরে দাঁড়াল। লোকটা বিশ্রী ভাবে চেচিয়ে উঠল—ইস্ বড় ঢং জানিস মাইরী। পালিয়ে আর যাবি কোথায়? তারপর চেঁচিয়ে দু তিনটে বিশ্রী অশ্রাব্য গালাগাল দিল, যাতে সহজে অনুমান করা যায়, মা বোনের প্রতি তার না কোন শ্রদ্ধা আছে, না নিজের কন্যার প্রতি কোন স্নেহ ভালবাসা।

এবার ভিখারিণীটা ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। কখনও এর কাছে হাত পাতছে, কখনও ওর দিকে।

একজন স্থূলকায় বুড়ো যে এইমাত্র বিরাট একটা গাড়ির গহ্বর থেকে তার ভুঁড়ি-শরীর সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে এল, মেয়েটিকে পাঁচ নয়াপয়সা দিয়ে থপ থপ পায়ে এগিয়ে গেল। মেয়েটি বারে বারে তার কাছে আকুল আবেদন পেশ করতে লাগল—দেড়টা টাকা চাই শেঠজী! মাত্তর দেড়টা টাকা! সারা জীবন আপনার ভালোর জন্য দোয়া চাইব। ঈশ্বর আপনাকে লাখ লাখ টাকা দেবেন শেঠজী! কিন্তু শেঠজী নিজের ভুঁড়ি সামলাতে সামলাতে সমুদ্রের একদিকে মুখ রেখে বসে পড়ল, দূরে কালো অন্ধকার জলে চৌপাটির রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিল।

তারপর সে এগিয়ে গিয়ে একজন মাঝবয়েসী মহিলার কাছে হাত পাতল। পরনে সিল্কের শাড়ি, গলায় মুক্তো হার নিয়ে সে তখন তার দুটো মেয়েকে সঙ্গে করে বেড়াচ্ছিল। একজনের পরনে শ্ল্যাক্স, অপরটির হাঁটু তোলা ফ্রক। তাদের উঁচু হাই-তোলা হিল ফুটপাতে খটাস্ খটাস্ করে শব্দ তুলছিল। মেয়েটি অনেকখানি পথ তাদের পেছু পেছু দেড় টাকার কান্না গেয়ে ফিরল কিন্তু তিনজনের কেউ একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখল না, তার কথার কেউ জবাব দিল না। আমি মনে মনে ভাবলাম—ঠিক হয়েছে, এ সব ভিখিরীদের কোন জবাব দেওয়াই উচিৎ নয়—যেন ওদের কোন উপস্থিতিই নেই।

এখন সে একটি তরুণ যুগলের কাছে কাঁদছিল। দুজনে এইমাত্র প্যারিসিয়ান ডেয়ারী থেকে বেরিয়ে এসেছে। সিগারেটের দোকান থেকে

ছেলেটা এক প্যাকেট ভালো দামী সিগারেট কিনে আমার পাশেই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেটে আগুন ধরাল। সঙ্গিনী ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট গোল ধরনের আয়না বের করে রাস্তার লাইটের ম্লান আলোয় নিজের মেক-আপে মন দিল। এদের দুজনের কাছ থেকে অ-ডি-কলোন, ফরাসী সেণ্ট, ভাল কফি, উৎকৃষ্ট পান এবং খুশী ভরা উচ্ছ্বলিত ভালবাসার মিশ্র সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছিল—এরি মধ্যে ভিখারিণীর বিশ্রী ঘাম, নোংরা এবং দারিদ্র্যের দুর্গন্ধ তাদের ছেঁকে ধরল। সঙ্গিনী রুক্ষ দৃষ্টি তুলে ভ্রু-কাঁপিয়ে ভিখারিণীকে দেখল, অস্ফুট শক্ত গলায় উঃ বলে সঙ্গীর বাহুতে হাত রেখে এগিয়ে গেল। ভিখারিণী সেখানেই শক্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মনে মনে গালাগাল দিলাম, আহা, কত সুন্দর রোমাণ্টিক মুডেই না জোড়া বেঁধে দুটিতে ছিল, আর হতচ্ছাড়ী মাগী, ঐ চেহারা দেখিয়ে সব মুড নষ্ট করে দিল। অকর্মার ধারী ফাঁকিবাজ, বদমাশ, পাজী, ছিনাল কোথাকার।

অবশেষে সেই ছিনাল মাগী দালালের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি ওর অনুসরণ করলাম। কেন? আমি ঠিক করেছি, এ সব ভিখারী আর ভিখারিণীদের সমস্ত ব্যাপার সমাজের কাছে তুলে ধরব—যাতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি তাদের প্রতারণা থেকে রক্ষা পায়। পত্রিকায় রচনা না হোক, সম্পাদকের নামে চিঠি দিলেও জানানো চলবে। দেশের সবাইকে জানিয়ে দেব, তাদের কাছে হস্ত প্রসারিত করে বাপের মদের জন্য দেড় টাকা চাওয়া সরলা ভিখারিণী আসলে নোংরা এবং বেশ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

বড় পোষ্ট অফিসের পেছনে ছোট্ট একটা গলিতে দালালটা তাকে একটা হোটেলের ভেতরে নিয়ে গেল। তার অনতিদূরে একটা ফুটপাথে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

আধঘণ্টা পরেই সে বেরিয়ে এল। দালালটা ওর হাতে একটা নোট গুঁজে দিয়ে বলল—এই নে পাঁচটা টাকা। চিন্তার কোন কারণ নেই। যখন দরকার পড়বে—সোজা আমার কাছে এখানে চলে আসিস। বুঝলি।

মেয়েটা কোন জবাব দিল না। দালালটা বিড়ি ধরিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আর সে বড়ীবন্দর স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল। বাডালার একখানি টিকিট কিনল-থার্ড ক্লাসের। আমিও বাডালার টিকিট কিনে ফেললাম—ফার্স্ট ক্লাসের। এই নাটকের শেষ অংকটুকু দেখার জন্য ওর বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। যদিও আমার বিশ্বাস, ওর কোন বাপ নেই, কখনও ছিল না।

বাডালা স্টেশন থেকে বেরিয়ে সে রেললাইন পার করে একটা কুঁড়ে ঘরের কাছে দাঁড়াল। ধীর স্বরে কাকে যেন ডাকল, ভিখু, ভিখু।

কি ? ভেতর থেকে ঘুম জড়ানো স্বর ভেসে এল। অন্ধকারে কুঁড়ে ঘরের দরজায় মলিন ধোঁয়াটে ছায়া এসে দাঁড়াল।

তিন পাইন্ট দে তো।

দেড় টাকা দে।

এই নে, কিন্তু তাড়াতাড়ি কর।

দেশী মদের বোতল নিয়ে সে বস্তীর অন্য দিকে এগিয়ে গেল। আমিও ছায়ার মত তার পেছনে লেগে আছি। মনের মাঝে রাগ আর ঘৃণার স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। হারামজাদি মাগী শুধু বেশ্যাই নয়—মাতালও। এই তিন পাইন্ট বোতলের জন্য হারামজাদি প্রত্যহ সন্ধ্যের সময় লজ্জা-মান খুইয়ে ভিক্ষে চাইবার অভিনয় করে খদ্দের তল্লাসী করে বেড়ায়। তারপর সেই পাপার্জিত ধন দিয়ে বিষের বোতল কেনে। কে জানে, এ ব্যবসায় কত ভদ্রলোককে নিজের নোংরা রোগ বিতরণ করে বেড়াচ্ছে। সে শুধু নির্লজ্জ বেহায়া ভিখারিণীই নয়, বা বদচলন মেয়েই নয়, বরং নারী রূপে একটা বিষাক্ত সর্পিনী।

ভদ্রতার মুখোশ পড়া শয়তান, মানুষকে পাপ ও নোংরা পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সৌন্দর্য নয়, বরং একটা গভীর খাদ—যা থেকে সমস্ত মানুষকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।

একটা ভাঙা-চোরা কুঁড়ে ঘরের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। কুঁড়ে ঘরে চাটাই ঘেরা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে পিদিমের আলো দেখা যাচ্ছিল। সে দাঁড়াতেই আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা পাথরের সঙ্গে জুতোর শব্দ ওঠা মাত্রই সে চমকে উঠল। ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল—আমি সেখানে—

কে তুমি ? সে চুপসে ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করল। ভয় আছে, পাছে গলার স্বর উঁচু হলে বস্তীর লোকদের জড়ো হবার সম্ভাবনা আছে। কে তুমি ? আমার পেছনে পেছনে আসছ কেন ?

এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে ? আমিও ধীর স্বরে জবাব দিলাম, আমার কাছ থেকেই ত তুমি প্রথমে দেড়টাকা চেয়েছিলে, এখন দেড়টাকার জায়গায় পাঁচটাকা পেয়েছ।

অন্ধকারেও মনে হোল, রাগে, লজ্জায় ওর চেহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়ে উঠেছে। চাপা স্বরে শক্ত গলায় বলল, তুমি তো তখন সরিয়ে দিয়েছিলে, এখন আবার এসেছ কেন, বাবু ?

ডাক্তারকে দেখতে—যে তোমার বাবার জন্য বিষের বোতল আনতে বলেছে।

সে বলল—বাবা রোগে ভুগছেন। খুব কষ্ট। এই মদ তাকে খেতে না দিলে সারা রাত যন্ত্রণায় কাতড়াতে থাকে।

মিথ্যেবাদী কোথাকার—মনে মনেই ভাবলাম, কিন্তু তার মিথ্যে কথার জবাবে বললাম—রোগ যখন, হাসপাতালে নিয়ে যাওনা কেন ? সেখান থেকে

কোন ওষুধ ত মিলত।

হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম বাবু, কিন্তু তারা বলছে-এ রোগ সারবে না। এ রোগের চিকিৎসা নেই।

কি হয়েছে তোমার বাবার ?

বড় সাংঘাতিক রোগ বাবু—আঁতে ক্যান্সার। বলছিল বিলেতেও নাকি এর কোন ওষুধ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই সব মিথ্যে কথা মনে পড়ল, যা আজীবন ভিখারীদের মুখে শুনে আসছি। 'হুজুর, আমার ছোট ছোট বাচ্চারা তিনদিন ধরে উপোস আছে—পেটে কোন দানা পড়ে নি।' 'শেঠ সাহেব, আমার সমস্ত জিনিস স্টেশনে চুরি হয়ে গেছে, গাড়ি ভাড়ার জন্য দশটা টাকা পেলে বাধিত হব।' 'বাবুরা আমার বাবার লাশ সেই সকাল থেকে পড়ে আছে দাহ সংস্কারের জন্য কুড়িটা টাকা চাই।' মিথ্যে, মিথ্যে—সব মিথ্যে ! এখন এই ভিখারিণীটাও আমার সামনে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছে—ওর বাপ ক্যান্সারে ভুগছে। ঠিক—মিথ্যেই তো ভিখারীদের একমাত্র সম্বল।

বুঝি সে আমার অবিশ্বাস বুঝতে পেরেছে। বলে উঠল, বাবু। বিশ্বাস না হলে, ভেতরে গিয়ে দেখে নিন।

আমার হাতখানি সঙ্গে সঙ্গে বুশ শার্টের পকেটে এসে থামল। একশ' টাকার তিনখানা কড়কড়ে নোট আমার বুকে শির-শিরানী তুলছিল। (সেদিন আমি মাইনে পেয়েছিলাম)। নির্জন ঘরে এই জোয়ান ভিখারিণীর সঙ্গে ভেতরে গেলে এর ফল যে কি হবে—তা আমি জানি। এমন কত ঘটনা, রহস্য নভেলেই শুধু নয়—দৈনিক পত্র-পত্রিকায়ও পড়েছি। কম করলে ব্ল্যাকমেল আর বেশী হলে আমায় খুন। আমার সমস্ত বুক কেঁপে উঠল, মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিলাম কেন যে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে এই নির্জন বস্তীতে চলে এলাম। কিন্তু তার কাছে কোন ভয়-শঙ্কা প্রকাশ করলাম না। জোর গলায় বললাম—আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করো না। তোমার বাবা ভেতরে থাকলে—ডাক দাও, তারপর তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু আমি জানি, ভেতরে কেউ নেই।

বাবা। সে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু ভেতর থেকে কোন প্রত্যুত্তর এল না। বাবা ! পুনরায় সে চেঁচিয়ে ডাকল কিন্তু পূর্বের মতই নির্জনতায় সেই ডাক ছড়িয়ে ফিরে এল।

বাবা !···বাবা।···বাবা, জবাব দিচ্ছ না কেন ?

কারণ তোমার বাবা মোটেই নেই, আমি তাকে জবাব দিলাম, ব্যস এবার তোমার অভিনয় থাকুক। তোমার মিথ্যে অভিনয় সব কিছু ধরা পড়েছে। এখন যাও—আর ঐ তিন পাইন্ট মদ খেয়ে পড়ে থাকো গে।

সে বিড় বিড় করতে করতে ঘরের ভেতরে গেল। আমি অন্ধকারে ফিরে আসার জন্য রাস্তা খুঁজতে লাগলাম। কয়েক পা এগিয়েছি মাত্র, হঠাৎ হৃদয় মথিত করে দেওয়া একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। আমি কিছু না ভেবেচিন্তেই কুঁড়ে ঘবেব দিকে দৌড়ে গেলাম।

কুঁড়ে ঘবেব দরজায় সে দাঁড়িয়ে স্থির—কালো পাথরের প্রতিমূর্তি। ভেতরে পিদিমেব কম্পমান আলো তার বিক্ষুব্ধ বিস্রস্ত চুলে, চেহারার এক পাশে আলো অন্ধকারেব ছায়া কাঁপছিল।

বাবু, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। বাবা নেই।

ভেতবে একটা ছেঁড়া খাটিয়ার ওপর শুধু মাত্র অস্থি-কংকাল একটি মৃতদেহ পড়ে ছিল। চোখ জোড়া উন্মুক্ত-যেন কারো প্রতীক্ষা করছে। একটা হাত, হয়তো যন্ত্রণা চাপার জন্য পেটে রেখেছিল—সেখানেই শক্ত ভাবে আঁকড়ে রয়েছে। অন্য হাতটা প্রসারিত—তার বাঁকানো আঙুলটা এক কোণে ইশারা করছে—যেখানে কতকগুলি শূন্য বোতল রাখা।

অকস্মাৎ আমার মুখ থেকে কয়েকটা কথা বেরিয়ে এল—আমার কানও যেন সহজে বিশ্বাস করতে চাইল না—'তোমার পয়সার দরকার পড়বে হয়তো, এই নাও।' মন্ত্রমুগ্ধের মত আপনা আপনি আমার হাত পকেটে উঠে এল। যে পকেটে তিনটে শ' টাকার নোট আমার বুক গরম করে রেখেছে—সে পকেটে নয়। অন্য পকেটে; কিছু রেজকী পড়েছিল যেথায়।

আমার হাতের চেটোয় রাখা পয়সাগুলি সে তার বড় বড় অশ্রু ভরা চোখে দেখল, মনে মনেই হয়তো গুনল, তার পর ঘাড় নাড়িয়ে নিঃশব্দে 'না' জানিয়ে অনেক কিছু জানিয়ে দিল। আমি তারপর সেখান থেকে ফিরে এলাম।

ঘরে ফিরে এসে কাপড় জামা ছাড়তেই দেখলাম, এখনও আমার মুঠি বন্ধ করা আছে। খুলতেই দেখলাম, আমার হাতের চেটোতে ঘামে ভেজা দু-টো আধুলি, একটা সিকি আর পঁচিশটা নয়া পয়সা আছে। পুরো দেড় টাকা। সঙ্গে সঙ্গে পয়সাগুলি এমন ভাবে ছিটকে ফেললাম, যেন সাপ কামড়ে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে শূন্য চেটো দেখতে লাগলাম—হলদেটে, সুরকির মত দাগ আঁকা রয়েছে। ব্যস্ত হয়ে শুঁকলাম, তা থেকে একটা গন্ধ নাকে ধরা দিল, রক্তের মত গন্ধ।

ওয়াশ বেসিনে লাক্স সোপ দিয়ে হাত ধুলাম, কিন্তু সে দাগ মিটল না। তার পর কারবোলিক সাবান ঘষলাম, তবুও দাগ মিটল না। ছোপা দিয়ে রগড়ালাম কোন ফল হল না। এবং সেদিন থেকে রোজ সাবান ঘষি, ছোপা রগড়াই, তোয়ালে দিয়ে মুছি, কিন্তু সেই হলদেটে সুরকির মত দাগ, যা থেকে রক্তের গন্ধ আসে, আজ অবদি আমার হাতের চেটোতে সে রকমই আছে। ডাক্তার বলে এ এক নতুন ধরনের কুষ্ঠ, কিন্তু আমি জানি—এ আমার হাতের ময়লা…।

রক্তের ডাক

এক জোড়া মনুষ্য তাদের চোখ দিয়ে নয়, তারা যেন পরস্পরের দিকে তাদের বন্দুকের অন্ধ চোখে লক্ষ্য করছিল।

এবং সে চোখগুলি নির্বিকার, শুধু লক্ষ্যস্থান ভেদ করা ছাড়া আর কিছুই জানে না। এও দেখে না বন্দুকের সামনে যে লোকটা রয়েছে—সে কি গোরা, কালো, না হলদে, বৃদ্ধ, যুবক, না কি শিশু; পুরুষ অথবা নারী? লোকটা বিবাহিত বা ছাপোষা লোক—তাও সে লক্ষ্য করে না। গত মাসে যে ছেলের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে, আর যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও রোজ প্রেয়সীকে চিঠি লেখে—তাও সে দেখে না।

দুজোড়া সেই অন্ধ চোখ কয়েক মিনিট ধরে একে অপরকে লক্ষ্য করছিল। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে বরফ ঢাকা। মাথার ওপর ছড়ানো সুনীল আকাশ। তার মাঝে কতকগুলি সাদা পাখী উড়ে বেড়াচ্ছিল, যেন মানস-সরোবরের হ্রদের নীল ঠাণ্ডা জলে রুপোর মত চকচকে মাছগুলি সাঁতার কাটছে। চারদিকে শান্তময় নিস্তব্ধতা আর এই নিস্তব্ধতার মাঝে নীল আকাশের নীচে একজোড়া অগ্নিগর্ভ অন্ধ কালো চোখ পরস্পরকে লক্ষ্য করছিল।

পরমুহূর্তে হঠাৎ একসঙ্গে দুটো গুলির শব্দ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে খান খান করে গুড়িয়ে দিল, যেন কোন দুরন্ত ছেলে দুষ্টুমী করে সজোরে পাথরের আঘাতে জানালার শার্সির কাঁচ ভেঙ্গে ফেলল। সেই শব্দটা কিছুক্ষণ ধরে কেঁপে কেঁপে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের মাঝে অনুরণিত হতে থাকে। পাথরের স্তরে স্তরে শব্দটা আঘাত খেল। ঘাঁটির দুপাশে ধাক্কা খেয়ে সে-শব্দটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ল। যেন কোন উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক পাগলাগারদের পাথুরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে ক্রমাগত বাইরে বেরোবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

দুটো উষ্ণ রক্তের রেখা পাথরের শুভ্র মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুদূরে ছড়িয়ে, ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসে, তারপর সেটা জমে যায়!

এবং সেই লোকটা—অনেকদূর থেকে যে এসেছিল, সে, কিছুক্ষণ ধরে জমে যাওয়া ছড়িয়ে পড়া রক্তের রেখার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল। বরফের শুভ্র কাগজে রক্তরেখায় না জানি কি সব লিখিত হয়ে গেল।

এ কোন লিপি ? লোকটা ভাবল। এ কোন ভাষা ? রক্তের লাল কালি দিয়ে কিসের ইতিহাস লিখিত হলো ? লোকটার মনে বিচিত্র এক অস্বস্তি এসে বাসা বাঁধল। অনেক দূর থেকে সে এই বিদেশী ধরিত্রীর বুকে মরতে এবং অজানা একজনকে মারতে ছুটে এসেছিল—তার যেন মনে হলো সে বুঝি স্বস্তিতে, শান্তিতেও মরতে পারবে না—যতক্ষণ না সে ঐ রক্তের কালি দিয়ে বরফের বুকে লেখা লিপির অর্থোদ্ধার করতে পারে। যে লিপি লিখিত হলো—তার অর্থ কি ?

রক্ত !

কালি !

বরফের চোখ ধাঁধানো শুভ্রতা ! খড়ি দিয়ে লেখা পাঠশালার বোর্ড !

আহত সৈন্যের স্মৃতি হিমালয়ের চূড়া পার করে তার নিজের দেশের দিকে এগিয়ে চলল। যৌবনের পাথুরে স্তর ভেঙ্গে, কৈশোরের ঢালু জমি পার করে শৈশবের নরম সবুজ ঘাঁটির কাছে এসে থামল। সব সময় যেখানে বসন্ত ছেয়ে থাকত, চেরীর ঝোপঝাড়ে ফুলগুলি সব সময় নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করত।

ঘাঁটির এক পাশের কুলু কুলু স্বরে গান গেয়ে বেড়ায় একটা পাহাড়ী নদী। তারই ধারে বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী একটা পাঠশালায় আরও জন-চব্বিশেক ছেলের সঙ্গে সেই লোকটা বসেছিল। তার চোখের সামনে বোর্ডের ওপর তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মত একটা অক্ষর। বৃদ্ধ গুরুমশায় শান-কুণের গলার স্বর তার কানে আসছিল। তিনি বলছিলেন ঃ

'চাঙ্গ-চুন, বোর্ডের উপর কি লেখা আছে, পড়ো ত ?'

'আমি জানি না গুরুমশাই। আমি যে পড়তে পারি না।'

'তুমি আট বছরের হলে, অথচ পড়তে পার না ? বড় লজ্জার কথা।'

'আমি যে একজন গরীব চাষার ছেলে, গুরুমশাই ?'

'চাষার ছেলেরও লেখা পড়া দরকার, চাঙ্গ-চুন। এই ছবির মত অক্ষরগুলিকে মনোযোগ দিয়ে দেখ। বলোত, প্রথম ছবিতে তুমি কি দেখছ ?'

চাঙ্গ-চুন মনোযোগ দিয়ে সে ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে বলল—'দুটো পা, দুটো হাত, একটা মাথা গুরুমশাই। মনে হচ্ছে, যেন একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।'

'একেবারে ঠিক। এর মানে হলো—মানুষ। এবার অন্য ছবিটা দেখ, এই যে গোল মত দাগ—এ হলো একটা হ্রদ ; যেমন ধরো হাঙ্গ চাউ শহরের কাছে হ্রদ রয়েছে। সমুদ্রের জলে স্রোতের উন্দামতা আছে কিন্তু হ্রদের জল, একেবারে শান্ত নিথর, তরঙ্গহীন—এই ছবির অর্থ হলো—শান্তি।'

এভাবে বৃদ্ধ শান-কুনে আলাদা আলাদা করে প্রতিটি ছবির মত

অক্ষরগুলির অর্থ বোঝালেন। অতঃপর চাঙ্গ-চুনকে জিজ্ঞেস করলেন—'এবার সব ছবিগুলি পড়ে শোনাও ত!'

চাঙ্গ-চুন পড়ে শোনাল, 'মানুষ শান্তিকামী। সমুদ্রের চতুর্দিকে বাসস্থিত পৃথিবীর মানুষেরা সবাই ভাই-ভাই।'

বৃদ্ধ শান-কুনে আরও বললেন 'এর চেয়ে মহান সত্য আর কিছু নেই।' তারপর আবার একটা নতুন বোর্ড চাঙ্গ-চুনের সামনে রেখে, তার ওপর তুলি নিয়ে নতুন একটা ছবি এঁকে দিয়ে বললেন, 'মনে রেখো চাঙ্গ-চুন, জ্ঞান লাভ করার একটাই মাত্র পন্থা। যখনই কোন অজানা লেখা তোমার সামনে এসে হাজির হবে, তুমি তার অন্তর্নিহিত অর্থ খোঁজার চেষ্টা করো।'

জীবনের শেষ মুহূর্তে সে দেখল, বরফের শুভ্র চাদরের গায়ে রক্তের লাল কালি দিয়ে প্রকৃতি না জানি কি লিখেছে। আর যতক্ষণ না সে এই লেখাটার অর্থ জানতে পারে, মুমূর্ষু অবস্থায়ও তাকে নিরুপায় হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

রক্তের রেখার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জোড়াও এগিয়ে গেল। সে দেখতে পেল, বরফের উপর জমে যাওয়া তার রক্তের সঙ্গে অন্য একটা রক্তের রেখা এসে মিলেছে। আর চাঙ্গ-চুন আশ্চর্য চোখে দেখল—এই রক্তটার লালিমা ততখানি, যতটা লাল তার রক্তের। সেই রক্ত-রেখার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ জোড়া পড়ে-থাকা লোকটার চেহারার কাছে এসে থামল।

মাত্র কিছুক্ষণ আগেও সে তার বন্দুকের কালো অন্ধ চোখ দিয়ে এই চেহারাটা লক্ষ্য করছিল। সে সময় এই চেহারায় ভয়ংকর শত্রুর ভয় মিশ্রিত ছিল। কিন্তু, এখন বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গে তার কালো অন্ধ চোখ দুটিতেও বরফের সাদা চাদর ঢাকা পড়েছে। এই মুহূর্তে চাঙ্গ-চুন তার নিজের চোখ দিয়ে সেই চেহারাটা দেখছিল, যে চোখে সে হাঙ্গ-চাউয়ের ধারে হ্রদের কিনারে বসে জলের বুকে গাছের কাঁপা কাঁপা ছায়া দেখেছিল; সে চোখে হলদে গোলাপের মত মেমীর মুখশ্রীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। শেষ বারের বিদায় নেবার সময় মেমীর কোলে শায়িত সরল, নিষ্পাপ শিশুর মুগ্ধ চেহারা দেখে নিজের বুকের মাঝে চেপে ধরেছিল—অনেকক্ষণ। আজ সেই চোখে শত্রুর চেহারা সে দেখছিল—মৃত হয়েও যাকে জীবিত বলে মনে হচ্ছিল, বুকে গুলি খেয়েও লোকটা হাসছিল।

হঠাৎ চাঙ্গ-চুনের যেন মনে হলো, সেই অপরিচিত ভারতীয় সৈন্যের মৃত ঠোঁটের হাসিটুকু যেন তাকে কিছু বলছে। কি বলছে সে? গুলি খেয়ে মরে কেউ কখনও কি হাসতে পারে? তারা দুজনেই পরস্পরের গুলি বুকে খেয়েছে। দুজনের বুক থেকে রক্ত বেয়ে বরফের ওপর এসে জমেছে। একজন মরে গিয়েও হাসছে আর অন্য জনকে কতকগুলি প্রশ্ন ভূত হয়ে বিরক্ত করছে,

ভয় দেখাচ্ছে আবার ধমকে দিচ্ছে। 'কি', 'কে', 'কোথায়' এবং 'কেন'। এই চারটি প্রশ্ন তাকে বাঁচতেও দিচ্ছে না, আবার শান্তিতে মরতেও দিচ্ছে না।

কেন? আমি কেন মরছি? এই ভাবতীয়কে আমি মারলাম কেন? চীনা-সৈন্য ভারতে কেন আক্রমণ করছে? কেন? কেন? কেন? কেন?

কি? কে? কোথায়? কেন?

'পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান এই চারটি মাত্র শব্দে জড়িয়ে আছে—সমস্ত ভূগোল, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র—সব। বিজ্ঞানের সৃষ্টি এই চারটি প্রশ্নে। কি? কে? কোথায়? কেন? প্রশ্নগুলি যেই তোমার মনে জাগবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানেব দ্বার তোমার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে উঠবে।'

প্রশ্ন কটি প্রফেসর লিন-তাইয়ের। কলেজে চাঙ্গ-চুনকে শুধু ভৌতিক-শাস্ত্র ও রসায়ন শাস্ত্রের সায়েন্স পড়ান নি—উপরন্তু ক্লাসের বাইরে তাকে বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মানব ইতিহাস এবং বিকাশ ক্রমের অন্ধকাব অংশগুলি উজ্জ্বল করে তার সামনে তুলে ধরে ছিলেন। বিপ্লব সম্পর্কে প্রফেসার লিন-তাইয়ের কথা সে প্রথম শুনেছিল—তার মুখেই প্রথন সে মার্কসের নাম শুনেছিল। একদিন সে বলেছিল—'প্রফেসার, আমাব মনে হয় আমরা এখনও আঁধারেই ডুবে আছি। বুদ্ধিবাদের নতুন ধর্ম গ্রহণ করে দেশের জনসাধারণ ভ্রম, অজ্ঞান ও অন্যায়ের আঁধার থেকে বাইবে বেরোতে পারে।'

প্রফেসর লিন হেসে বলেছিলেন, 'চাঙ্গ-চুন, মশাল পথ দেখাতে পাবে, আবার খামারেও আগুন ধরাতে পারে। শেষে এমন যেন না হয়, বুদ্ধিবাদের একটা মূর্তি গড়ে তার পূজো শুরু করে দেয়, আর মানুষেরা পুরনো ভ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নতুন ভ্রমের জালে আবদ্ধ হয়।'

'যদি তুমি যথার্থ বুদ্ধিবাদের সমর্থক হয়ে থাক—তাহলে সকল অবস্থায় প্রতিটি কথা, প্রতিটি সমস্যা সত্যতা এবং নিয়ম এগুলিকে চারটি প্রশ্নের কষ্টিপাথরে পরখ করতে ভুল করো না—কি? কে? কোথায়? কেন? এবং বিশেষ করে কেন?'

মেমীর আবার এই 'কেন' বলার স্বভাব ছিল।

তারা দুজনে একসঙ্গে পড়ত। ক্লাসে বাদামী চোখ, হলুদ-গোলাপের মত সুন্দরী ক্লাস-ফেলোর সঙ্গে চাঙ্গ-চুনের প্রেম হলো। একদিন সুযোগ পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মেমী, আমায় তুমি বিয়ে করবে?'

'কেন?' মেমী অনায়াসেই তার সরলমনে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাকে বিয়ে করব কেন?'

চাঙ্গ-চুন বিব্রত হয়ে উঠেছিল। 'এইজন্য···মেমী···মানে আমি···মানে আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'কেন ?' মেমী পুনরায় সেই প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি আমাকে ভালবাস কেন ?'

'এও কি একটা প্রশ্ন হলো নাকি ? তোমাকে এজন্যে ভালবাসি···মানে··· আমি তোমাকে ভালবাসি······মানে তোমাকে খুব ভাল লাগে তাই··· ।'

'কেন ভাল লাগে ?' মেমীর পুনরায় সেই অবাধ্য প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে সে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল।

'হেসো না মেমী।' তার আবেগ কণ্ঠে ধমকের আভাস।

পলকমাত্র হাসি থামিয়ে মেমী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন হাসব না ?' আবার সে হাসতে লাগল।

পরমুহূর্তে চাঙ্গ-চুন প্রবলভাবে মেমীর হাত ধরে নিজের বুকের কাছে টেনে এনেছিল। তার কোমল নরম শরীরখানি সে নিজের বাহুপাশে জড়িয়ে মেমীর হাসিভরা ঠোঁটে তার উষ্ণ ঠোঁটখানি পরশ করেছিল।

কিন্তু, তারা আলাদা হতেই মেমী আবার দুষ্টুমী করে হেসে সেই প্রশ্নটা আওড়েছিল—কেন ?

মেমীর কোলে এক বছরের শিশু। কিন্তু তার ঠোঁটে সেই পুরনো প্রশ্ন ঃ 'কেন তুমি যাচ্ছ ?'

চাঙ্গ-চুন জবাব দিয়েছিল, 'দেশে বিপ্লবের ঢেউ আনার জন্যে যাচ্ছি। আর জনসাধারণকে কুয়োমিতাংগের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দিতে হবে।'

আবার সে তার সৈন্যপোষাক পড়ল ; কোণের আলমারীতে রাখা পুরনো বন্দুক বের করল। এবারে মেমী তিনটে সন্তানকে কোলে জড়িয়ে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল—'কেন ? এবার কেন যাচ্ছ ?'

এবারে সে কোন জবাব দিতে পারেনি।

মেমীর গলায় আবার সেই প্রশ্ন ঃ 'কেন যাচ্ছ ?'

চাঙ্গ-চুন জবাব দিয়েছিল, 'হুকুম এসেছে।'

'হুকুম—' মেমী চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কিসের হুকুম ? যারা তোমাকে পাঠাচ্ছে, তুমি তাদের জিজ্ঞেস কর নি কেন তারা তোমাকে পাঠাচ্ছে ?'

চাঙ্গ-চুন বিরক্ত হয়ে উঠল। সে-কথা প্রকাশ করতে ইতস্তত করছিল, রুক্ষ স্বরে বলল—'মেমী, আমাদের প্রশ্ন করা কাজ নয়। আমাদের কাজ শুধু হুকুম মেনে চলা।'

উত্তরে মেমী তার দিকে এমন চোখে দেখছিল যেন সে তার পরিচিত নয়—জীবনে এই প্রথমবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। 'এ তুমি কি বলছ চাঙ্গ-চুন ? তুমি না প্রফেসার লিন-তাইয়ের শিষ্য ? মনে আছে, তিনি তোমায় কি বলেছিলেন ? প্রতিটি কথা, প্রতিটি সমস্যা, সত্যতা এবং সিদ্ধান্ত—চারটি প্রশ্ন কষ্টিপাথরে ঘষে পরখ করতে যেন ভুল করো না ঃ কি ? কে ? কোথায় ?

কেন? বিশেষ করে কেন? না, আমি তোমাকে যেতে দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমাকে বলবে—কোথায় যাচ্ছ এবং কেন যাচ্ছ?'

'কেন যাচ্ছি এ আমি জানি না। আমাকে বলা হয়নি। এবং কোথায় যাচ্ছি এ বলার আমাব অনুমতি নেই। তবে এখান থেকে অনেক দূরে। কয়েক হাজার মাইল দূবে—দক্ষিণ সীমান্তে।'

শুনেই মেমী একেবারে নিষ্প্রাণ হিম হয়ে গেল। পাশেব কামবা থেকে একটা দুর্বল স্বর ভেসে এল, 'সীমান্তে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিস নাকি চাঙ্গ-চুন? আমার সঙ্গে দেখা করে যা খোকা।'

মেমীর অগ্নিগর্ভ চোখ থেকে আড়াল হবার জন্য চাঙ্গ-চুন তার বাবার ঘরে চলে গেল। সত্তব বছবেব অপারগ বৃদ্ধ চাঙ্গ-শুন পুরনো বইযে ঘেরা পালঙ্কের ওপব শুয়ে শুয়ে জীবনেব শেষ দিন গুনছে।

'কি বাবা?'

ইতিমধ্যে চাঙ্গ-শুনেব মগজ আর কোথাও চলে গেছে।

'পাগল, সব কটা পাগল।' সে বিড় বিড় কবে বলল।

'কে পাগল, বাবা?'

'ওরা সব পাগল। বিনে কারণে যারা কোন শান্তিপ্রিয় দেশেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।'

'বাবা!' চাঙ্গ-চুন ঘাবড়ে চাপা স্বরে বলল—'বাবা, এমন কথা উচ্চারণ করাও ভয়ঙ্কর।'

বুড়োর গলা দিয়ে ভারী-ফাঁপা একটা শব্দ বেরলো, হাসি—সেই সঙ্গে কাশির দমকও। 'যে বলেছে, তাকে তোমাদের পুলিশও ধরতে পারবে না।'

'কেন পারবে না?'

'কারণ, আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে সে মারা গেছে।'

'ও তাহলে এটা পুরনো প্রবাদ। কিন্তু এ-সব কথা আওড়ানোও অপরাধ বাবা। আমাদের নিজেদের শাসনকর্তার অনুগত হওয়া উচিৎ।'

'অনুগত? কিসের অনুগত?' বৃদ্ধ কয়েকবার আওড়াল। তারপর একটা পুরনো ছেঁড়া বইয়ের পাতা উলটে পড়তে শুরু করল:

'তাওয়ের শপথ।

যে তাহার শাসনকর্তার প্রকৃত অনুগত হইয়া থাকে, সে শাসনকর্তার সৈন্যদল এবং যুদ্ধ ইত্যাদি হইতে বিরত রাখিবে। কারণ, যাহারা যুদ্ধ করে তাহাদের পরিণাম বড় খারাপ হইয়া থাকে। সৈন্যদল যে পথ দিয়া গমন করে সে স্থানে ফুলের পরিবর্তে কাঁটা জন্ম নেয় এবং ক্ষেত্র-মাঠ সকলে ফসলের পরিবর্তে আকালের ফসল জন্ম নেয়।'

'বাবা, এ তুমি কোন শত্রুর লেখা চিঠি পড়ছ?'

'এটা লাও-ৎসে চাঙ্গ-চুন। তাকেও তোমার পুলিশ ধরতে পারবে না। দু' হাজার বছর পরে তার কবরে এতটুকু হাড়ের ছিটেফোঁটাও হয়তো নেই।'

'লাও-ৎসে সেকেলে ফিলসফার, আজকের রাজনীতির হালচাল সম্পর্কে জানবে কি করে? জানো বাবা, আমাদের সৈন্যেরা কোথায় যাচ্ছে?' চাঙ্গ-চুন এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ বাবার কানে কানে আস্তে আস্তে সেই নামটা আওড়াল, যা সে মেমীকেও বলে নি: 'ভারতে।'

কিন্তু চাঙ্গ-শুন, যেন কিছুই শোনে নি। পুরনো বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ছানি-পড়া চোখ জোড়া বড় করে পড়তে শুরু করল:

'ভারতের অধিবাসীরা বড় শান্তিপ্রিয় এবং কথায় তাহারা বড় বিশ্বাসী হইয়া থাকে। তাহারা কাহাকেও প্রতারণা করে না এবং প্রতিটি দেশের সহিত তাহাদের মৈত্রী-সম্পর্ক এবং সদ্‌ভাবনা আছে।'

'বাবা, এ সব আজে বাজে কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে বলোত? তুমি কি আজকাল মস্কো রেডিয়ো শুনছ?'

'হয়তো, চৌদ্দ'শ বছর আগে হিউ-এন সাঙ্গ মস্কো রেডিয়ো থেকেই শোনাত।'

'বাবা! তুমি ভারত সম্পর্কে এসব পুরনো বইয়ের ওপর আর ভরসা করো না। ভারতীয় সৈন্যরা চীনের ওপর আক্রমণ করেছে। আমাদের দেশকে আমরা রক্ষা করতে যাচ্ছি।'

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তরে বিড় বিড় করে দুটো ছন্দ পড়ল:

'এই সকল সীমান্তে—যেখানে কেবল নির্জন হিমক্ষেত্র বিস্তৃত, সে স্থানে না জানি কত রক্তপাত ঘটিয়াছে, চীনের সম্রাট সাম্রাজ্য বিস্তারের নিমিত্ত তথায় সৈন্যদল প্রেরণ করিত—এবং সেস্থানে শুধু সৈন্যদিগের রক্তপাত ঘটিত।

'বাবা, এসব মড়া-মান্ধাতা কবিদের প্রলাপ শোনার আর সময়-ধৈর্য নেই। অনুমতি দাও, আমি যাচ্ছি।'

'যাও খোকা। তুমি আমার অনুমতি ছাড়াই এ পৃথিবীতে এসেছিলে, আবার আমার অনুমতি ছাড়াই এ পৃথিবী থেকে চলে যাবে।'

জীবনের শেষ মুহূর্তে আরেকবার তার দৃষ্টি রক্তের রেখা বেয়ে মৃত-দেহের কাছে এসে থামল। সে ভাবল, 'আশ্চর্য! লোকটা মরে গিয়েও হাসছে। যেন পরাজিত হয়েও জয়ী; মরে গিয়েও অমর হয়েছে। তার সংস্কার, শেষ কৃত্য তার স্বদেশেই হবে আর আমার সংস্কার হবে স্বদেশ থেকে অনেক দূর বিদেশে—অন্য ভূমিতে। তার দেশের মাটি মায়ের মত তাকে স্নেহ ভরে কোলে তুলে নেবে। তার মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র তার স্মারক-সমাধির ওপর ফুল উৎসর্গ করতে আসবে।

'কিন্তু যে লোকটা হাসছে—কে সে ?

'আমার এই হাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে, অথচ আমি জানি না—কে সে ? কি সে ? আমার হাতে মরবাব জন্য কেন সে এসেছিল ? কিছুক্ষণ পরে আমিও মরে যাবো আর আমার এই প্রশ্নগুলিও আমাব সঙ্গে সঙ্গে কবরে বিলুপ্ত হবে।'

শরীর থেকে তিল তিল করে বেরিয়ে যাওয়া জীবনকে সে যেন কিছুক্ষণের জন্য আঁকড়ে ধরল। বাঁ-হাতে বুকের ক্ষতস্থান চেপে ডান হাতের সাহায্যে বরফের ওপর ঘষটে ঘষটে এগোতে লাগল। মাত্র কয়েকগজ দূরে লোকটা পড়ে আছে, অথচ তার মনে হতে লাগল যেন সে তিন হাজাব মাইল দূরে পড়ে আছে। আবেকবার সে যেন হাঙ্গ-চাউ থেকে বোম-দিলাব পথে যাত্রা সুরু করেছে। আর এই দীর্ঘ পথে শুধু রক্ত-রেখা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সে রক্তরেখা তাকে সীমান্ত পার করিয়ে ভারতে নিয়ে এল, একটা হাসি ভবা চেহারা তার জন্য সেখানে পথ চেয়ে ছিল।

তার হিম-শীতল কুঁকড়ে-যাওয়া আঙুলগুলি দ্রুতভাবে ভারতীয় সৈন্যের তালাশী করে ফেলল—তিনটে চিঠি পাওয়া গেল। কোন এক ভারতীয় ভাষায় লেখা—যা সে পড়তে পারল না। একটা ছোট ব্যাগ—ভেতরে দুখানি ছবি! ডাগর ডাগর এক জোড়া কালো চোখ নিয়ে যুবতী বউ; তিনটে শিশু—দুটো ছেলে একটা মেয়ে। লিন-কু, ছোট চিঙু আর ছোট মেমী। না! কি হয়েছে তার ? না, না, এরা তার সন্তান নয়। এরা ঐ ভারতীয় সৈন্যের সন্তান। ব্যাগের আরেকটা ভাঁজ থেকে একটা কার্ড বের হল। চাঙ্গ-চুন ভাবল—এর ওপর নিশ্চয়ই তার নামধাম লেখা রয়েছে। মরবার আগে অন্ততঃ জেনে যেতে পারব—কার প্রাণ আমি নিয়েছি আর কে আমার প্রাণ নিয়েছে।

কার্ডের ওপর ইংরেজীতে কিছু একটা লেখা রয়েছে। অনেক দিন আগে চাঙ্গ-চুন কলেজে ইংরেজী পড়েছিল। অক্ষরগুলি বানান করে সে ধীরে ধীরে পড়ল।

'লাইফ মেম্বার!'

'ইন্ডিয়া-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এসোসিয়েশন।'

ভারত-চীন মৈত্রী সংঘের আজীবন সদস্য।

চাঙ্গ-চুনের চোখের সামনে যেন কার্ড, চেহারা, মাটি, আকাশ, পাহাড় সব একাকার হয়ে গুলিয়ে উঠল।

'আজীবন ?' সে ভাবল, 'কিন্তু এখন তো তার জীবন নেই ? চীন ? ভারত-চীনের মৈত্রী সম্পর্ক কি ছিল ? কেনই বা ছিল ? কোথায় ছিল ?

'এর জীবন রইল না কেন ?'

'কে একে হত্যা করল ?'

'কেনই বা হত্যা করল ?'

যে প্রশ্ন এতক্ষণ ধরে তার মনে মগজে লুকিয়ে বসে ছিল জীবনের শেষ মুহূর্তে হঠাৎ তা উপচে বেরিয়ে এল।

কেন ?

কার্ডখানা তার হাত থেকে খসে পড়ল। চাঙ্গ-চুন বরফের ওপর ঝুঁকে কার্ডখানা তুলতে চাইল। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়—বরফের শীতলতায়ও মৃত্যুর হিম-শীতলতায—তার আঙ্গুলগুলি কুঁকড়ে চেতনাহীন হয়ে গিয়েছিল। দুহাতে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও সে কার্ডখানি তুলতে পারল না।

কিন্তু হাত দুটি সরিয়ে আনতেই আশ্চর্য চোখে দেখল—তার আঙ্গুলগুলি রক্ত মাখা।

কার রক্ত ?

নীচে ববফের উপর চেয়ে দেখল, হ্যাঁ, ঠিক সেই জায়গায় রক্তের দুটো রেখা দু পাশ দিয়ে এসে মিলিত হযে একাকার হয়ে গেছে।

তার আঙ্গুল, হাতে দুজনেরই রক্ত মাখা—সেই ভারতীয়ের রক্ত আর তার নিজের রক্ত।

চাঙ্গ-চুনের রক্ত-মাখা হাত দুটি তারপর আকাশের পানে প্রশ্নসূচক চিহ্ন করে তুলে ধরল।

'কেন ?' জীবনের শেষ মুহূর্তে মনে হল, মেমী তাকে প্রশ্ন করছে—কেন ? তার বৃদ্ধ পিতা তাকে প্রশ্ন করছে—কেন ? কেন ? তার সর্বকনিষ্ঠ আদবেব ছেলে আধো আধো গলায় প্রশ্ন করছে—কেন, বাবা, কেন ?

মৃত্যু-নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে শুধু একটা শব্দই বের হলো ঃ কেন ?

রক্তরাঙা বরফের স্তরে স্তরে একজন মুমূর্ষুর আওড়ানো প্রশ্নটা বেঁচে রইল।

'কেন ?'

বরফ-ঢাকা পাহাড়ের গায়ে এ প্রশ্ন অনুরণন তুলল।

কেন ?

শান্ত অসীম নীল আকাশ, ভারত থেকে চীন অবধি যার বিস্তৃতি—এই প্রশ্ন অনুরণন তুলল। আর যে উড্ডীন মুক্ত অচিন পাখি হিমালয়ের বরফ শীত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পিকিং-এর দিকে ফিরছিল—এই প্রশ্নের আঘাতে ছটফট করে উঠল।

বিশ্বসুন্দরী

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেটি দরজার কাছ ঘেঁসে বেঞ্চের ওপর বসে আছে। খবরের কাগজে একটি ছবির দিকে লক্ষ্য করে তার বন্ধুকে বলে—'লুক ম্যান, আইওনা পিণ্টো—বম্বে গার্ল! এ বছর ওয়ার্ল্ড বিউটি কণ্টেস্টে সেকেণ্ড হয়েছে।'

তার সঙ্গী দেয়ালেব গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। ট্রেনের গতির সঙ্গে মৃদু মৃদু দোল খায়, কাগজটা হাতে নিয়ে ভাল করে ছবি-টা লক্ষ্য করে, তারপর বিউটি কুইনের চেহারায় একমুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে বলে 'হোয়াট ম্যান! বায়কুলা রেলওয়ে ইন্সটিট্যুটে ডান্স নাইটে এমন মেয়ে বহু দেখেছি।'

তারপর দুজনেই তারা পরিচিত মেয়েদের সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে—স্টেলা ডি' সুজা—যাব 'বডি' নাকি একেবারে মেরিলিন মনরোর মত। লুসী—রক' এন রোলে পারদর্শিনী। ডোজী, একটু স্থূল বটে, তবে দারুণ স্মার্ট মেয়ে—সব সময় স্মাইলিং ফেস।'

আমি তাদের দু'ফুট দূরত্বের ব্যবধানে জানালার ধারে স্থূলাকৃতি লালাজীর মাঝে কোণঠাসা হয়ে বসে আছি, ফলে তাদের কথাবার্তা আমায় বাধ্য হয়ে শুনতে হয়। ভাবি, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যাদের বিচারক নিযুক্ত করা হয় তাদের মতামত জানাতে নিশ্চয়ই বিশেষ অসুবিধেয় পড়তে হয়। সৌন্দর্য কোন কষ্টিপাথরে যাচাই করবে? কি দিয়ে মেপে দেখবে? বা ওজন করে ঠিক করবে? বস্তুতঃ সেই মেয়েই কি সুন্দরী বলে বিবেচিত হবে—যার কোমর বিশ ইঞ্চি, বুক চল্লিশ ইঞ্চি এবং নিতম্ব বিয়াল্লিশ ইঞ্চি? কে সঠিক করে বলবে, মিশরীয় রমণীর কালো চোখটাই সবচেয়ে সুন্দর, না, আইল্যাণ্ডের রমণীর নীলাভ চোখ? হরিণের মত ডাগর ডাগর চোখ দুটোই কি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়? নাকি নেশা-ধরানো আধবোজা মঙ্গোলিয়ান চোখ জোড়াই মারাত্মক সুন্দর? কালো কুন্তলরাশি ও সোনালী কেশ-স্তবকের মধ্যে কাকে অপরূপ বলা যায়? কোন রঙটা পছন্দ করা চলে—ফিকে শালগমের মত ফর্সা, না পাকা গম দানার মত! শ্যামবর্ণ, না আবলুসের মত ঘন কৃষ্ণবর্ণ? সুঠাম শরীর গ্রীক-প্রতিমূর্তির মত আমেরিকান মেয়ে কি বেশী আকর্ষণীয়, নাকি ডল-পুতুলের মত ছোট-খাটো চীনা ও জাপানী মেয়ে? পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী কে, কোথায় এবং কেন?

ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত মন পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে। থার্ড ক্লাসের কামরায় যখন পা ছড়িয়ে বসার জায়গা থাকে না, আমি তখন এ ধরনের অবিচল এবং অবিনশ্বর দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে সময় কাটাই।

কয়েকটা প্রশ্ন সংবাদপত্রের পাতা থেকে উঁকি মারে, আর কিছু প্রশ্ন আমার মনে ফেনার মত বুড়বুড়ি কেটে ওঠে।

আমি কে, কি এবং কেন? আমার লক্ষ্য কি ও কোথায়? এই পৃথিবী কি বলের মত গোল! না, চৌকানো! না কি একেবারে সমতল? পৃথিবী কোথায় এগিয়ে চলেছে? আমাদের দেশের গন্তব্য কোথায়? চলন্ত ট্রেনে কামরার জানালা দিয়ে দেখলে মনে হয় আমি অবিচল, স্থির; দৃশ্যমান বস্তুসমূহ ক্রমশঃ পেছনে সরে যাচ্ছে। সম্ভবতঃ এই পৃথিবীও বিপরীত দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু, অন্য কোণ থেকে ভেবে দেখি, ঐ যে সামনে নিশ্চলা ও পাথুরে জমি অতিক্রম করে যে সীমারেখা দেখা যায়—আমাদের যা লক্ষ্য! সেদিকে পঞ্চাশ ষাট মাইল গতিতে এগিয়ে চলেছে—এও অনুভূত হয় আমার হৃদয়ের স্পন্দন ও রেল-স্লিপারের ঘর্ঘর শব্দ একই তালে বাঁধা।

হ্যাঁ, এ ধরনের একটা শাশ্বত চিরন্তন প্রশ্ন সম্পর্কে যখন আমি বিচার-বিশ্লেষণ করছি, সহসা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণীকে সেখানেই, সেই থার্ডক্লাশের কামরায়, অন্য এক কোণে বসে থাকতে দেখি। এক মুহূর্তে আমার বুকের ধুকধুকানি বন্ধ হয়ে যায়। চোখ জোড়া ভাল করে ঘষে দেখি, রক্তমাংসের শরীর। না, আমি জেগে স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু, ভীড়ের ঠাসা-ঠাসিতে তা আর সম্ভব কই? আমার বাঁ-হাত তখনো জানালায় চাপা পড়ে আছে, ডান হাতের উপর লালাজী বিশাল শরীর চেপে বসে আছে। আমি শুধু চোখের পাতা ফেলতে থাকি! না, স্বপ্ন নয়। ট্রেনের কামরায় আমি বসে আছি, তীব্র গতিতে ট্রেন বোম্বাইয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। থার্ডক্লাসের দরজার মুখে একেবারে ঠাসাঠাসি ভিড়। আমার সামনে স্থূলাকৃতি লালাজী বসে আছে, পাশেই তার স্ত্রী, দেড়ফুট লম্বা ঘোমটার আড়ালে চোখ জোড়া আনত-করে বসে। গা-ঘেঁসে তাদের বড় ছেলে 'চাঁদ-মামা' হাতে নিয়ে পড়ছে। লালাজীর ছোট ছেলে বারবার দাদার হাত থেকে পত্রিকাটি কেড়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। লালাজীর মেয়ে—জীবন্ত পুতুলটাকে কখনও শুইয়ে রাখে, কখনও বা তুলে বসায়—কিন্তু ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দেও পুতুলের কথা স্পষ্ট শোনা যায়। বিপরীত দিকে জানালা ঘেঁসে একটি স্থূলাকৃতি ক্রীশ্চান মেম বসে লালাজীর ছেলেটাকে মাঝে মাঝে ধমক দেয়, 'আরে বাবা, তুমি ন'টি হয়ো না। চুপচাপ সাইলেন্ট হয়ে বসে থাকো।' আমাদের সামনের সীটে শেরওয়ানি গায়ে চুগ্গী দাড়িওয়ালা মুন্সীজী বসে, সঙ্গে কালো বোরখায় ঢাকা তার

বেগম-সাহেবা। সঙ্গে সাতটা সন্তান। সর্বকনিষ্ঠ মুন্সীজীর বিবির বোরখার আড়ালে স্তন্য পান করছে। এবং বেগম সাহেবার অষ্টম সন্তানের সম্ভাবনা থাকলেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবার নেই।

তাদের পেছনের সিটে জানলার ধারে এক জটাধারী সাধু মহারাজ চোখ বুজে বসে আছে। জানালা দিয়ে বাইরের বাতাসে তার মাথা ও দাড়ির জটা চুল উড়ু-উড়ু করে। ঠিক তার মুখোমুখি টিপটপ পোষাকে একটি যুবক বসে আছে। সবে পাট ভাঙ্গা প্যান্ট, ক্লিপ আঁটা কলার, ইমিটেশন সিল্কের ডোরাকোটা টাই, কোটের কলারে প্লাস্টিকের ফুল গোঁজা, এবং তেল চকচকে চুলে যত্ন ও সাবধানে সিঁথি বার করা। হয়তো কোথাও ইণ্টারভিউ দিতে চলেছে, নয় ক'নে দেখতে। তাদের সামনে তিনজন মাঝ বয়সী লোক এই ভিড়েও আনন্দে তাস পিটে চলেছে। পাশেই একজন ঢ্যাঙাটে ধরনের সপ্রতিভ যুবক দাঁড়িয়ে, সিটের তলা থেকে কেরিয়ারের কৌটা বের করে মেয়েটির হাতে তুলে দেয়—সম্ভবতঃ মেয়েটি তার প্রেমিকা, অথবা স্ত্রী। হ্যাঁ, সেই মেয়েটিই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী। আর ওদিকে কেউ নেই। শুধু জানালা, জানালার বাইরে দৃশ্যমান, পলায়নরত পৃথিবীর মায়া মাখানো উঁকি। আমি যেন দেখতে পাই, আমগাছের তলায় ময়ূরের উন্দামনৃত্য, বিদ্যুতের তারের উপর পরস্পর ভালবাসার আবেগে ঠোঁট কামড়াকামড়ি করা টিয়ের চঞ্চলতা, আকাশের গায়ে ধূসর মেঘের আনাগোনা, আর কালো মেঘ চিরে সূর্যের কিরণ আলোর একটা জাল বুনে দেয়।

সে তখন ক্যারিয়ার থেকে বাটিগুলো আলাদা করে সাজিয়ে রাখায় ব্যস্ত। আমি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে দেখি। হ্যাঁ, দেখার মত বটে। এমন সুন্দরী মেয়ে পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখিনি—বোম্বাইয়ের ফিল্ম অ্যাকট্রেসদের মধ্যে, দিল্লীর হোটেলে, ক্লাবে, সোসাইটি লেডিজদের ভিতরে, বাংলাদেশের স্টেজে, রাজস্থানের রাজোয়ারাদের রঙমহলে—কোথাও নয়। কিন্তু আমি ঠিক করে উঠতে পারি না, এই সুন্দরীর কোন অংশটি অনির্বচনীয়, অনন্য—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী রূপে প্রমাণিত করে। তার রঙ ফর্সা নয় বরং চাপা গমের রঙ, কিন্তু গাল দুটি অপরূপ কমনীয়তায় টস্-টস্ করছে—রুজ বা পাউডারে এমন হওয়া অসম্ভব। এ যেন কমনীয়তা নয়, তাপ—উনুনের লেলিহান আগুনের ছায়া যেন এসে পড়েছে। যখনই সে ভারি চোখের পাতা তুলে পুরুষের দিকে চায়, বাদামের মত তার গভীর কালো চোখজোড়ায় বিচিত্র আলো ফুটে ওঠে। মনে হয় এক বিচিত্র ভারে তার আধ খোলা ঠোঁট দুটি লিপস্টিকহীন—সম্ভবতঃ জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ও সব চেয়ে বিষাদময় অনুভূতির সঙ্গে সে পরিচিত। তার দীর্ঘ ঘন কেশগুচ্ছ বিন্যস্ত, পরিপাটি। তার হাতে,-

বাহুতে কোন গয়নাগাটি নেই, কিন্তু যৌবন যেন উপচে পড়ছে। সাড়ির আড়ালে মেহেদি রং মাখা অস্পষ্ট পা জোড়া কোমল ও ক্ষুদ্রাকার। তার চেয়েও কোমলতর, সুগোল, মসৃণ মাংসপেশীময় বহু পা আমি দেখেছি, সুন্দরতর চোখও আমার নজরে পড়েছে। কিন্তু, সামগ্রিক ভাবে সেই অপরিচিত নারীর চেয়ে সুন্দরী রমণী আমি কোথাও দেখিনি। তার অসীম সৌন্দর্য্যের আড়ালে রহস্যই বা কি ?

এখন তারা দুজনে খাবার খাওয়ায় ব্যস্ত—লুচি, তরকারি, আচার। মেয়েটি আন্তরিক ভাবে সেগুলো বের করে, ছেলেটিও তেমন ভাবে খেয়ে চলে। আমি একবার ভাবি, লুচিগুলো নিশ্চয়ই দারুণ আগ্রহে ভেজেছে, তরকারিও বেশ পরিপাটি করে রেঁধেছে, তারপর বোয়াম থেকে আচার বের করে টিফিন ক্যারিয়ারে রেখে—আজ তারা দুজনে বেরিয়ে পড়েছে। সম্ভবতঃ এই তাদের দু'জনের প্রথম বাইরে বেরনো। তারা পরস্পর যেমন রঙ ধরা চোখে বারবার দেখছিল, যেন তাদের সবে বিয়ে হয়েছে। এবং বিয়েটাও নিজেদের পছন্দানুসারে। বাপ মা'র দেখাশুনো বিয়েতে এমন ভালবাসা গাঢ় হয় নাকি ? সম্ভবতঃ, এরা দুজনে 'হনিমুনে' বেরিয়েছে। ক'মাস ধরে ছেলেটাকে টেনেটুনে টাকা জমাতে হয়েছে, এখন সে তার প্রেয়সীকে স্ত্রীকে বোম্বে বেড়াতে নিয়ে চলেছে। সেখানে নিশ্চয়ই কোন ছোটোখাটো হোটেল দেখে তারা উঠবে, এই প্রথমবার হয় তো তারা ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে জুহু যাবে। মেয়েটি সেখানে দুহাতে সাড়ির ভাঁজ সামলে সমুদ্রে হাঁটু ডুবিয়ে অস্তমিত সূর্যের রূপ দেখবে। ছপছপ করতে করতে সমুদ্রের ঢেউ তার পায়ে শির-শিরানি তুলবে, মুহূর্তে তার সর্ব শরীর-মনে একধরনের বিচিত্র অনুভূতি ছেয়ে যাবে—আদর করার আগে চুমু খাওয়ার মুহূর্তে যেমন ছেয়ে যায়। ছেলেটি হয়তো একটা ডাব হাতে করে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসবে, তারপর তারা দুজনে সেই ডাব নিয়ে কাড়াকাড়ি করে মিষ্টি জলটুকু খেয়ে নিঃশেষ করবে, পরস্পরের ঠোঁটের মিষ্টি আনন্দটুকুও সেই সঙ্গে উপলব্ধি করবে। তারপর, ডাবটাকে বলের মত সমুদ্রের দূরান্তে ছুঁড়ে ফেলবে, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ আবার তাদের পায়ের কাছে ডাবটাকে আছড়ে এনে ফেলবে। আবার তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাবটা ছুঁড়ে ফেলবে, এবারে সমুদ্রের অনেকটা দূরে গিয়ে পড়বে। দুজনেই অকারণে হেসে উঠবে, হেসে গড়িয়ে পড়বে খিলখিল শব্দে—এমন কি সমুদ্র-সৈকতে ভ্রমণ বিলাসীরাও সহসা ফিরে তাদের দিকে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে দেখবে। কেউ হয়তো বলে উঠবে, 'ঐ দ্যাখো, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী।' আর কেউ বলবে—'ওর সঙ্গে যে পুরুষ রয়েছে, সে হলো বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান পুরুষ।'

না, তারা এখনো জুহুর সৈকতে এসে পেঁছায় নি। থার্ড ক্লাস

কম্পার্টমেণ্ট ভর্তি প্যাসেঞ্জারদের ভিতরে এখন খাবার খাচ্ছে। আমি স্পষ্ট লক্ষ্য করি, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান পুরুষ দারুণ ভোজন রসিক, সে তার স্ত্রীকে খাইয়ে দেয়। মেয়েটি লজ্জানত, অনুরাগ মিশ্রিত চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে দেখে, চোখেমুখে এক ধরনের বিচিত্র, অপরূপ লালিমা ফুটে উঠে ভালবাসার চাপা আগুন চমক দিতে থাকে। সহসা যেন বুঝতে পারি, কেন সে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী! তার এই সৌন্দর্যের রহস্য হলো—প্রেম! সেই প্রেমের তাপ যেন তার চোখে সুস্পষ্ট। সেই প্রেমের আঁচ তার গালজোড়ায়, সেই প্রেমের উচ্ছলতা তার যৌবনে ঢেউ তোলে, প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তা যেন ছাপিয়ে ওঠে।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেটি বলে ওঠে—'লুক্ ম্যান—এই ছবিটা দ্যাখো। মিস্ য়ু. এস. এ, বিউটি কম্পিটিশনে এ বছর ফার্স্ট প্লেস পেয়েছে, মোস্ট বিউটিফুল গার্ল ইন দি হোল ব্লাডি ওয়ার্ল্ড, ম্যান। আই উড গিভ মাই রাইট হ্যাণ্ড জাস্ট টু হ্যাভ ওয়ান লুক অ্যাট হার।'

ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলি, 'য়ু ফুলস্, ওয়ার্ল্ডের মোস্ট বিউটিফুল গার্ল এখানেই—এই ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করা কমপার্টমেণ্টে, তোমাদের কাছ থেকে কয়েক ফার্লং দূরে বসে আছে, আর তুমি কিনা গোটা বিশ্ব খোঁজ করে বেড়াচ্ছ।'

ট্রেনের গতি ক্রমশঃ কমে আসে। রেল-লাইনে ঘর্ঘর শব্দ ওঠে, ট্রেন ঝাঁসী ষ্টেশনে এসে দাঁড়ায়। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান পুরুষ প্লাটফর্মে নাবে। তার সঙ্গে আলাপ করাব জন্য আমিও প্ল্যাটফর্মে নাবি।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সৌভাগ্যবান পুরুষ ইতস্ততঃ চেয়ে দেখে। সম্ভবতঃ 'পানি পাঁড়ে'র খোঁজ করবে। তার কাছে গিয়ে আমি সরাসরি বলি—'হনিমুনে বেরিয়েছেন বুঝি?'

প্ল্যাটফর্মে দারুণ ভিড়। চিনেবাদাম, পুতুল, আইসক্রীম, পাখা আর কুলীদের হৈ চৈ, স্পষ্ট করে কিছু শোনা যায় না। আমার দিকে ফিরে সে উৎসুকভাবে বলে, 'আপনি আমায় কিছু বললেন বুঝি?'

আমি এবার অপেক্ষাকৃত জোরে বলি—'হনিমুনে বেরিয়েছেন বুঝি?' 'আজ্ঞে···' সে কৌতূহলী চোখে বলে—'কার কথা বলছেন?' আমাদের বছর ছ'য়েক হলো বিয়ে হয়েছে।'

আমার চোখেমুখে আশ্চর্যভাব ফুটে উঠতেই সে হেসে ফেলে 'আমাদের চার বছরের বাপিকে ওর দিদিমার কাছে রেখে এসেছি।'

তারপর ইতস্ততঃ চারদিক চেয়ে বলে—'এক্সকুজ মী, আমি একটু দইবড়ার কাছে যাচ্ছি। ও'র আবার দইবড়া খাওয়ার দারুণ শখ।' বলেই সে ভিড়ে মিশে যায়।

গার্ডের বাঁশী বেজে ওঠে, নিশান ওড়ে। প্যাসেঞ্জাররা আবার কম্পার্টমেন্টে উঠে বসে। আমিও নিজের জায়গায় এসে বসি। সামনের সিটে দেখি, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী ব্যস্ত-ত্রস্ত চোখে প্ল্যাটফর্মের চারদিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, লক্ষ্য করি সেই আশঙ্কিত চেহারাতেও একটা সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। প্রেমের আঁচ।

ট্রেন নড়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়ায়, যেন এক্ষুণি ট্রেন থেকে নেবে দাঁড়াবে। কিন্তু, আর এগোয় না, চোখ মুখের আশঙ্কা সহসা হাসিতে পালটে যায়। দরজায় চোখ পড়ে, চলন্ত ট্রেনে সেই ভাগ্যবান পুরুষ উঠে পড়েছে—তার হাতে দইবড়ার ভাঁড়, চোখে ভালবাসার গাঢ় রঙ ও বিজয়োল্লাসের গর্ব। যেন সে চোখে চোখে বলে—'দেখলে তো, তোমার জন্য দইবড়া আনলাম কিনা। দুনিয়ায় এমন কি আছে, যা তোমার জন্য আনতে পারবো না? একবার মুখ ফুটে বলেই দেখ না।'

* * *

প্রতিবছর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলে, পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে সেই সম্পর্কে লেখা হয়। মিস্ আমেরিকা বলেন, 'আমি কমলা লেবুর রস খেয়ে আমার রূপ, সৌন্দর্য টিকিয়ে রাখি। মিস্ বৃটেন বলেন, 'আমি রোজ সকালে 'পোরিজ' খাই।' মিস ফ্রান্স আঙ্গুর ও আঙ্গুরের রস খাওয়া পছন্দ করে থাকেন। মিস জার্মানী তার দেহ শরীর স্লিম ও সুঠাম রাখার জন্য আটার পাউরুটি খান—ক্রিম ছানা দুধ মিশিয়ে। কিন্তু, আমায় যদি জিজ্ঞেস করা হয়, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী কি খান, আমি বলবো, তিনি দইবড়া খেতে সব চেয়ে বেশী পছন্দ করেন—বিশেষ করে তার স্বামী যখন প্ল্যাটফর্ম থেকে হন্তদন্ত হয়ে চলন্ত ট্রেনে দইবড়ার ভাঁড় হাতে করে ছুটে আসে। এবং সে নিজে হাতে করে দইবড়া খাওয়াবার জন্য জেদ্ ধরে।

ট্রেন ক্রমশঃ এগিয়ে চলে। ষ্টেশন পেছনে পড়ে থাকে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই সুন্দরী তার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। ঘুমেও কত অকুণ্ঠ ভরসা কাঁধেও অফুরন্ত ভালবাসার স্পর্শ। তার ঘুমকাতর চেহারাও কতো সুন্দর—হয়তো ঘুমের ভিতরে কোন মধুর স্বপ্ন দেখে হাসছে। অনেকক্ষণ ধরে ওদের দুজনের সম্পর্কে আমি ভাবতে থাকি। বিয়ের ছ'টি বছর পার করেও তাদের ভালবাসায় যৌবনের তীব্রতা, লাবণ্যের এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। মনে মনেই স্থির করি, বোম্বেতে নেবেই তাদের সঙ্গে আলাপ করবো, এবং পরিচয়টাকে আরও গভীর করে ঝালিয়ে নিতে হবে, হ্যাঁ—এই অপরূপ ভালবাসার গূঢ় রহস্য কি? ভাবতে ভাবতে জানালার ধারে মাথা রেখে শুয়ে পড়ি। বাঁ কানে লালাজীর নাসিকা-ধ্বনি গর্জন করে, ডান কানে ট্রেনের চাকার ঘর্ঘর শব্দ, আর পেছনে অ্যাংলো

ইণ্ডিয়ান যুবকটির গলায় গানের ভাঁজ শুনতে পাই—

ডার্লিং ডার্লিং ক্লীমেণ্টাইন,

আই অ্যাম ড্রিমিং অফ য়ু…

* * * *

স্বপ্নে আমি দেখি, পৃথিবীর যাবতীয় নারী এবং প্রতিটি যুগের রমণী-বৃন্দ সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় একজোট হয়েছে। মিশরের ক্লিওপেট্রা, ইরাণের শীরিন, আরবের লায়লা, ভারতের পদ্মিনী, ফ্রান্সের জোজেফাইন, ইংলণ্ডের লেডি গোডেভিয়া, দান্তের প্রেয়সী ইতালীর বিয়েত্রিস—সবাই এসে হাজির। কালো, ফর্সা, শ্যামবর্ণ? গম রঙ-সোনালী-কালো কেশদাম। কবি, শিল্পী, স্তাবকদের কাল্পনিক ও বাস্তবিক প্রেমিকা—সকলেই একজোট হয়েছে। স্তাবক, প্রেমিক ও প্রশংসকেরা চেঁচাচ্ছে চারদিক থেকে ঃ

ভোট ফর ক্লিওপেট্রা

আপনি শীঁরিন কে ভোট দিন,

হ্যাঁ, কেবল শীঁরিণের জন্য।

পদ্মিনীর মত রূপসী কখনো সৃষ্টি হয়নি হবেও না।

আসুন, লেডি গোডেভিয়ার নগ্ন সৌন্দর্য উপভোগ…

এদের কথা শুনে আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'সব ভুল, সব প্রলাপ! আসুন,—আমার সঙ্গে চলে আসুন। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী যদি দেখতে চান! হ্যাঁ, সে এখন থার্ডক্লাসের ঠাসাঠাসি গাদাগাদি কম্পার্টমেণ্টে তার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে শুয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভেঙ্গে পড়ে। চোখ খুলে দেখি, আকাশ ফর্সা, ট্রেণ ইগৎপুরী স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী রমণী ও সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ—দুজনের কেউই নেই।

'ওরা গেল কোথায়?' খালি জায়গাটার দিকে ইশারা করে লালাজী ও মুন্সীজীকে জিজ্ঞেস করি। 'মশাই, আমার ঘুমও এইমাত্র ভাঙ্গলো,'—মুন্সীজী গলা খাকারি দিয়ে রাতের বাসি পাণের গুঁড়ো থুতুর ছিটেয় ফেলতে ফেলতে বলে—

'কিগো, তুমি দেখেছ নাকি?'

বোরখার ভিতর ঘুমঢুলু বিবিজান মাথা নাড়ায়।

'রাত্রে হয়তো কোনো স্টেশনে নেবে পড়েছে।' লালাজী বিরাট একটা ঢেকুর তুলে বলে। তার স্ত্রী ঘোমটা খুলে ঝিমোচ্ছে দেখে, সামান্য ঠেলা দিয়ে বলে—'শুনছো, এখন ওঠো! বোম্বে এলাম বলে।'

মুন্সীজী আবার আমায় বলে—'ওদের সঙ্গে কি কোন দরকার ছিল? দেখুন তো, এই স্টেশনে নেবেছে কিনা?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াই, তারপর গাড়ি থেকে নেবে পড়ি।

প্লাটফর্মে নেবেই চোখে পড়ে, সামনে বসে আছে—বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী।

না, এ সেই মহিলা নয়। তার রঙ ছিল পাকা গমের মতো সোনালী হলুদ—এর রঙ একেবারে কালো—আবলুসের মত।

তবুও এ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী। এর হাসিতেও সেই ধরনের আকর্ষণীয় ছটা, আধখোলা ঠোঁটের ফাঁকেও ভালবাসার মাদকতা ছড়ানো। চোখেও নেশাধরানো রঙ। কোলের শিশুর মুখে পুরুষ্টু স্তন গুঁজে দুধ দিচ্ছে। কালো, বাবরি চুলের একটা জোয়ান মরদ তার দিকে চেয়ে বার বার হাসছে। লোকটা বসে বিড়ি টানছে। ওদের আশে পাশে রেল কুলীমজুর, অনেকে বৌ-বাচ্চা সঙ্গে করে বসে আছে! তাদের গেরস্থালি জিনিষ-পত্তর ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ—টিনের ক্যানেস্তারা, চটের থলে, ঘটি-বাটি, আরও কিছু কিছু টুকি-টাকি সরঞ্জাম। কাজ করার যন্ত্রপাতিও পড়ে আছে—কোদাল, গাঁইতি, পাথর বইবার চুপড়ি। ও গুলোর মধ্যেই ওরা দুজনে বসে আছে—বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী এবং সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান পুরুষ।

পরস্পরের চোখে চোখ রেখে ওরা দেখে। হাসে। অকারণেই। ওঁদের দাঁতগুলো সকালের সোনালী রৌদ্রে ঝিক্‌মিক করে। চোখ থেকে রঙ ঝরে পড়ে, আর ওদের দুজনকে ঘিরে যে ভালবাসার আলোর পরিধি ছড়ানো—তা কেবল আমার চোখেই ধরা পড়ে। সূর্যের আলোয় তপ্ত, পরিশ্রমে গঠিত, ভালবাসায় উদ্ভাসিত মেয়েটির সুন্দর যৌবনময় শরীরে যে রূপ ছড়িয়ে পড়েছে, তা, কোন ড্রইংরুমে কোন ফিল্ম স্টুডিয়োতে, বা কোন হোটেল রেঁস্তোরায় চোখে পড়েনা।

'তোমরা কোত্থেকে আসছো ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

অচেনা লোকের মুখে কথা শুনে লজ্জা পায়। কিন্তু, মরদটা বিড়ি ফেলে দিয়ে বলে—'অন্ধ্র থেকে।'

'কতদিন হলো তোমাদের বিয়ে হয়েছে ?'

'বনে-জঙ্গলে আমরা রাস্তা তৈরী করি বাবু। সারাদিন পাথর ভাঙ্গি। বিয়ে করার আর সময় কোথায় ? দেশে যখন ফিরবো, পুরুত ডেকে মন্ত্র পড়বো। কি গো ?' বলেই ও দ্বিধাসঙ্কোচহীন ওর দিকে চায়। তার স্ত্রীর দিকে। সম্পর্কহীন নারীর দিকে।

ইঞ্জিনের বাঁশী বেজে ওঠে। আমি আবার কম্পার্টমেণ্টে ফিরে আসি। চলন্ত ট্রেণ থেকে দেখি, কালো তাগড়া জোয়ানটা বাচ্চাটাকে শূন্যে লোফা-

লাফি করছে, আর বাচ্চাটা খিলখিল করে হাসছে। বাচ্চার মা তাদের দু'জনের দিকে ভালবাসা ও গর্বিত চোখে চেয়ে দেখছে।

কিছুদূরে ট্রেণ বাঁক নেয়। আমার দৃষ্টি থেকে তারা ক্রমশঃ হারিয়ে যায়। এখন আর কম্পার্টমেণ্টে তেমন ঠাসা-ঠাসি নেই, প্রায় শূন্য। কেবল লালাজীর পরিবার ও মুন্সীজীর বোরখা ঢাকা বিবি ও ছেলেমেয়ে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটি চুলে চিরুণী বোলাতে বোলাতে পাশের বন্ধুকে বলে—'আজ ইভনিঙে ষ্টেলাকে সঙ্গে করে পিকচার দেখতে যাবো। ষ্টেলাকে জানো ত? ওম্যান, মোস্ট বিয়ুটিফুল গার্ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।'

রিটার্ন টিকিট

মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্য মানুষেরা যে সব বিভিন্ন যন্ত্র ও উপায় আবিষ্কার করেছে—তার মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক হলো—টেলিফোন।

সাপের কামড়ে যদিও বা মন্ত্র-ঝাড়ফুঁক আছে—কিন্তু টেলিফোনের কামড়ে জল পাওয়াও দুরূহ হয়ে ওঠে।

টেলিফোনের ভয়ে সারা রাত ভাল করে আমার চোখে ঘুম নাবে না—কি জানি, ভোরবেলায় কার আবার অপয়া স্বর শুনতে পাবো। রাত দুটো-আড়াইটে ওকি জেগে জেগে যদিও বা ঘুম আসে, কিন্তু স্বপ্নেও দেখতে পাই, পৃথিবীর যাবতীয় ঘণ্টি, ঘণ্টা, ঘড়ি ঘণ্টা সব একযোগে বাজতে শুরু করে—মন্দিরের বড় বড় পেতলের ঘণ্টা, পুলিশ থানার ঘড়িঘণ্টা, দরজার গায়ে কলিংবেলের ঘণ্টি, সাইকেলের ক্রিং ক্রিং, ফায়ার ইঞ্জিনের ক্রেঙ্গ ক্রেঙ্গ, আর যেই চোখ খোলে—শুনতে পাই টেলিফোনের ঘণ্টি বাজছে। এই অসময়ে, গভীর রাতে কার ফোন এল? নিশ্চয়ই ট্রাঙ্ক কল! মুহূর্তে সমগ্র মন এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। মাদ্রাসে এক বন্ধু রোগে ভুগছে, একজন আত্মীয় লণ্ডন-বোম্বাইয়ের পথ-মাঝে প্লেনে আছে। ভাইপোর ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরোবার কথা।···

ফোন তুলে বলি—হ্যালো!

অন্য তরফ থেকে কিছুটা ব্যস্ত-বিব্রত স্বর ভেসে আসে—'চুন্নী ভাই—কেম ছো?

আমি জানাই, এখানে কোন চুন্নীভাই নেই, না কেম ছো?'

কিন্তু সে বলে চলে, 'চুন্নীভাই, টাটা ড্যাফর্ড ওপরে যাচ্ছে।'

'যেতে দাও।'

সে গুজরাতীতে গালাগাল দিয়ে বলে ওঠে, 'যেতে দাও বললেই যেতে দেব? ব্রিটিশ ইলেকট্রিকের ব্যবসায়ে আগেই ঢের লোকশান খেয়েছি।'

আমি তাকে বোঝাই, 'মশায়, আমি চুন্নীভাই নই!'

'ওঃ।' ওপাশ থেকে স্বর ভেসে আসে, যেন টিউব থেকে সব বাতাস বেরিয়ে চুপ্‌সে যায়। 'তমে চুন্নীভাই নথী ছো?'

এবার আমি জিজ্ঞেস করি, 'কোন নম্বর আপনার দরকার?'

'এইট-সেভেন-এইট সিক্স-সিক্স!' ওপাশ থেকে সে বলে।

'এটা এইট-সিক্স-এইট-সেভেন-সেভেন।

সে এবার ধমক দিয়ে বলে ওঠে—'বটে, আগে আপনি বল্লেন না কেন এটা রঙ নাম্বার।

আমি বলি—'আচ্ছা ভাই, আমারই দোষ। আমায় ক্ষমা করো।' বলেই ফোন রেখে দিয়ে নিদ্রাদেবীকে আবার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কড়িকাঠ গুণতে শুরু করি।

তারপর সকালে ওঠার পর একের-পর-এক টেলিফোনের ঘণ্টি বাজতে থাকে।

"হ্যালো, আপনি আমায় ঠিক চেনেন না। আপনাদের পুরনো বাড়ী পানিপতের পাশে যে পাড়া আছে—রেওয়াড়ী; সেখান থেকে আসছি—ফিল্মের হিরো হতে চাই···"

"আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে চাই, আমার লেখা শোনাতে চাই···"

"আগামী রোববার আমাদের সভার বার্ষিক উৎসবে কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা আগে থেকেই আপনার নাম ঘোষণা করে দিয়েছি···"

"প্রেসে ম্যাটার পড়ে আছে, শুধু আপনার লেখার প্রতীক্ষায়···"

"হ্যালো, আপনি আমাকে চেনেন না বটে, কিন্তু দয়া করে কি আমায় রাজকাপুরের অ্যাড্রেস দিতে পারেন?···"

কাল সকালের ঘটনা, ফোনে অনবরত এসব চলছিল, এরি মাঝে একবার ফোনের ঘণ্টি বেজে উঠল। অনেক সাহস সঞ্চয় করে আমি ফোন তুললাম।

'হ্যালো।' আমি বললাম, যদিও টেলিফোন ডায়ারেক্টোরীর আদেশানুসারে হ্যালো বলা নিষেধ।

'হ্যালো।' অপর প্রান্ত থেকে পরিপাটি য়ুরোপীয়ান ঘেঁষা স্বর শোনা গেল। ভাবলাম, কোন আমেরিকান বা ইংরেজ কথা বলছে।

ওপ্রান্ত থেকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করল, 'আমি কি খ্বাজা আহমদ আব্বাসের সঙ্গে কথা কইতে পারি?'

আমি ইংরেজীতেই উত্তর দিলাম, 'আমিই আব্বাস বলছি, আপনি?'

সঙ্গে সঙ্গে ফোনের অপর প্রান্তে ইংরেজী হিন্দীতে রূপান্তরিত হলো, কিন্তু উচ্চারণের ভঙ্গিমা ইংরেজীর মত—যেন কেউ বিলেতে লেখাপড়া করে দশ বছর বাদে দেশে ফিরে এসেছে। 'আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছ নাকি?'

কিছুটা দ্বিধা-সংকোচে মিথ্যে কথা বললাম—'গলার স্বর চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, মাফ করবেন আপনাকে······'

সে আমার কথায় বাধা দিয়ে, খুব সঙ্কোচে, ইংরেজী ঘেষা উচ্চারণে

বলল। মনে হলো, কোন ইংরেজ সেনানীর কর্ণেল হিন্দীতে কথা বলছে—রাখো তোমার কথা। জানো, প্রায় পঁচিশ বছর পর তুমি আমার গলা শুনছ। আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল লখনৌ-এ—উনিশ শো ছত্রিশে।

হঠাৎ কি করে যেন আমার মনে একটা স্মৃতির ঘণ্টি বেজে উঠল। বললাম—'কে, বিরজেন্দ্র কুমার সিংহ? বিরজু?

ওপ্রান্ত থেকে স্বর এল, 'রাইট, বিরজু!'

'বিরজু!' আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সত্যি! এতদিন কোথায় ছিলে? কি করছিলে? আজকাল কি করছ?

টেলিফোনেও যেন মনে হলো, ওপ্রান্তে জবাব দেয়ার আগে একটা দীর্ঘশ্বাসের আভাষ। যখন সে কথা বলল, তার কণ্ঠস্বর আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, যেন কোন গভীর ভাবনায় ডুবে আছে—"সে এক দীর্ঘ কাহিনী। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এখন আসতে পারি কি?"

আমি বললাম—'শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে জুহুতে আমি থাকি। তবে, রোজ দুপুরে একবার করে শহরে যাই। বরং এক কাজ করা যাক, কোন রেঁস্তোরায় একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খাওয়া যাবে। এখানে বোম্বেতে তোমাদের লখনৌর মত একটা 'মেফেয়ার রেঁস্তোরা' খুলেছে।'

"মে-ফেয়ার?" রেঁস্তোরার নাম সে এমন ভাবে আওড়াল, যেন কেউ হঠাৎ তাকে বিদ্রূপ করছে, "না-না, তোমার সঙ্গে কোন রেঁস্তোরায় দেখা করতে চাই না। লোকেদের বড্ড বেশী ভিড়। ভাল করে আমরা কথা বলতে পারব না।"

'বেশ' আমি বললাম, 'তাহলে তুমি চলে এসো, আমি অপেক্ষা করবো।' কটা নাগাদ আসবে?

চার্চগেট থেকে জুহু যেতে ট্যাক্সীতে যতটা সময় লাগে।

'ধরো, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ মিনিট……আমি বারান্দায় তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।' তারপর হঠাৎ মনে পড়তেই বললাম, 'আর শোনো, লক্ষ্মী যদি সঙ্গে থাকে, তাকেও নিয়ে এসো—বৌদির সঙ্গে আলাপ……' সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে একটা কথা জাগতে বললাম, 'আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই, ব্রাদার।'

কিন্তু ওপ্রান্ত থেকে কোন জবাব এল না, টেলিফোনের লাইন তার আগেই কেটে গেছে।

* * *

পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে আমার মনে পঁচিশ বছরের পুরনো ছবি ভেসে উঠতে লাগল।

বিরজু…

বিরজেন্দ্র…

বিরজেন্দ্র কুমার সিংহ…

কুমার বিরজেন্দ্র কুমার সিংহ

বিরজু…

আমার বন্ধু বিরজু…

বিরজু, দি বিউটিফুল…

বিরজু, দি ব্রিলিয়ান্ট…

বিরজু দেখতে সুন্দর, সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান, টেনিস চ্যাম্পিয়ান এবং য়ুনিয়নের সেরা ডিবেটার।

বিরজু, যাকে কেন্দ্র করে ডজন খানিক মেয়ে প্রেমের স্বপ্ন দেখত…

হাইকোর্টের জজ, জাস্টিস স্যর রমেশ সাক্সেনার মেয়ে, আশা সাক্সেনা জি. আই. টি. কলেজের ছাত্রী…

ডাঃ সতীশ ব্যানার্জীর মেয়ে করুণা, যার টানাটানা সুন্দর চোখ জোড়া যামিনী রায়ের কোন ছবি থেকে চুরি করা বলে ভুল হতো…

প্রফেসার হামিদ আলীর ছোট বোন সুরাইয়া সাজিদ আলী, কয়ামাত হুশেন গার্লস্ কলেজের পর্দানশীন পরিবেশ ত্যাগ করে সে বছর য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। য়ুনিয়ন হলের প্রতিটি ডিবেট ও নাটকে প্রথম সারিতে বসত, যাতে সে বিরজুকে আশর্মিটিয়ে দেখতে পায়…

সরলা মাথুর, হিন্দীতে এম. এ., এবং কবিতা লিখত। তার প্রতিটি কবিতায় বিরজুর রূপের উদ্দাম প্রকাশ পেত…

সিলভিয়া টমসন, স্টেশন মাস্টারের মেয়ে, ক্লাবের প্রতিটি ডান্সে বিরজুকে নিমন্ত্রণ জানাতে নিজেই হোস্টেলে হাজির হত, যদিও সেখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।…

বিরজু…

বস্তুতঃ সে ঈর্ষাযোগ্য পুরুষ ছিল।

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল, যখন সে আলিগড় য়ুনিভার্সিটি আয়োজিত অল ইণ্ডিয়া ডিবেটে অংশ গ্রহণ করার জন্য লখনৌ য়ুনিভার্সিটি থেকে এসেছিল।

পঁচিশ বছর পরেও, তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়নের তরফ থেকে আমি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে স্টেশনে গেছিলাম। সেই ট্রেনে লখনৌ, এলাহাবাদ, বেনারস ও কানপুর কলেজের ডিবেটাররা এসেছিল। সব মিলিয়ে জনা বারো-চৌদ্দ ডিবেটার। কিন্তু তাদের মধ্যে কেবল একজনই ব্যতিক্রম ছিল। সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, গলা বন্ধ ফুল সোয়েটারে ঢাকা পেশীবহুল অ্যাপলো

মূর্তির মত সুগঠিত গড়নই শুধু ছিল না, বরং তার চেহারায় বিচিত্র ধরনের সরল মাধুর্যময় হাসি ছেয়ে ছিল। তার সঙ্গে করমর্দনের পর, সেই হাতে এক গভীর আন্তরিক ও উষ্ণতার আভাস পেলাম। বুঝতে পারলাম, আমার সঙ্গে আলাপ করে সে বাস্তবিক খুব খুশী হয়েছে। সেই অল্প সময়েই মনে হলো, আমরা দুজনেই পুরনো সঙ্গী এবং বহুদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত।

তারপর, অল ইণ্ডিয়া ডিবেট।

প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল—সামাজিক জাগরণ ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা গুরুত্বহীন।

এই বিতর্কে আমি বিপক্ষে বলেছিলাম। বক্তৃতায় আমি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আন্দোলনের সমর্থনে বেশ জোরালো গলায় বললাম। সেই সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড ধিক্কার দিলাম, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে এবং বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমাজ-সংস্কারের কৃত্রিম আবরণের মাঝে আশ্রয় অন্বেষণ করে। আমার বক্তৃতা শেষ হতেই হলভর্তি করতালি বেজে উঠল, আমি ভাবলাম জয় আমার সুনিশ্চিত।

আমার পরে লখনৌ য়ুনিভার্সিটির বিরজেন্দ্র কুমার সিংহের নাম ঘোষিত হল। শুভ্র ফ্লানেলের পাৎলুনের ওপর গলা-বন্ধ নীল যোধপুরী কোটে নিঃসন্দেহে তাকে আকর্ষিত করে তুলেছিল। তখনও সে বিতর্ক শুরু করেনি, এরি মধ্যে ওপরের গ্যালরীতে চিকের আড়ালে, যেখানে কলেজের মেয়েরা বসে ছিল, সহসা কৌতূহলের মধুর শিহরণ ছড়িয়ে গেল। চিকের পেছনে কালো, আয়ত, সুন্দর চোখ এবং রঙীন আঁচল ঝলমল করতে লাগল।

'মিস্টার প্রেসিডেণ্ট!'

বিশুদ্ধ ইংরেজীতে সে বক্তৃতা দিতে শুরু করল—

আমার পূর্বে একজন সঙ্গী যখন বক্তৃতা শেষ করে, তখন উৎসাহে সকলেই করতালি দিয়েছে, আমিও দিয়েছি। বস্তুতঃ তার বক্তৃতা বেশ জোরালো ছিল। আমার বিচারে বক্তৃতার সর্বোত্তম পুরস্কার আমার সঙ্গীর-ই প্রাপ্য, কারণ সামান্য একটা বিষয় নিয়ে এমন মনোগ্রাহী, গভীরভাবে, বিচার-বিশ্লেষণ করে পরিবেশন করা বাস্তবিক কৃতিত্বের ব্যাপার···

সে আমার প্রশংসা করছে কি না, বুঝে ওঠার আগেই আমার দিকে দেখে, তারপর হেসে বলল—

'আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গী একজন সফল উকিল প্রমাণিত হবে······'

এই কথায় গোটা হল তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ল, তাতে আমার যাবতীয় জোরালো যুক্তি একেবারে ভেসে গেল।

ডিবেটে সে প্রথম পুরস্কার পেল, আমি দ্বিতীয়। আলীগড়ে সে মাত্র

তিনদিন ছিল। প্রথম দিন'সে' মিস্টার বিরজেন্দ্র কুমার সিংহ', দ্বিতীয় দিনে 'বিরজেন্দ্র'; এবং তৃতীয় দিনে কেবল 'বিরজু' হয়ে গেল। হৃদয় ও মানসিক মতভাবনা যখন মিলে একাকার হয়ে যায়, তখন দূরত্বের ব্যবধানও দ্রুত হ্রাস পায়।

স্টেশনে তাকে সী-অফ করতে গিয়ে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, "সামাজিক জাগরণ যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, একথা কি তুমি ডিবেটের খাতিরে প্রমাণিত করলে, নাকি বাস্তবিক তুমি তা বিশ্বাস কর?"

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরেও তার সেই উত্তর আমার কানে বাজছে। সে বলেছিল, 'শোনো! দেশের ও জাতির স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু তা অর্জন করা তেমন শক্ত নয়। কিন্তু সামাজিক জাগরণ—যা আমাদের মনে যুগ যুগ ধরে পরাধীন—তাকে স্বাধীন করা মোটেই সহজ-সাধ্য নয়। এবং, যতদিন না আমাদের মানসিক চিন্তা-ভাবনার জাগরণ হবে না, আমাদের দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অর্থহীন থাকবে।'

তারপর সে একটা দামী কথা বলেছিল, ধরো, ভারত স্বাধীন হলো। অথচ, ধর্ম্মীয় অন্ধবিশ্বাস সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি, এবং ঘৃণার বন্ধন থেকে আমাদের মন মুক্ত হলো না, তাহলে ভেবে দেখো, কি হবে? এত দিনের শিক্ষাদীক্ষা, এবং সমাজ-সংস্কারের আলোচনা করার পরেও এমন ক'জন শিক্ষিত হিন্দু আছে, যারা তাদের মন নির্বিশেষে জাত-ধর্মের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে? তোমাদের মুসলমানদেরই মধ্যে বা এমন ক'জন আছে, যারা শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, জোলা এবং কুমোরদের সম-দৃষ্টিতে দেখে?

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, "বিরজু তুমি? আচ্ছা, তোমার হৃদয়-মন কি এসব বন্ধন থেকে মুক্ত? তুমি একজন উচ্চবংশীয় রাজপুত হয়ে একজন অস্পৃশ্য মেয়েকে বিয়ে করতে পারো, বা, কোন বেশ্যার মেয়েকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে পারো?"

সে আমার চোখে-চোখ রেখে বলেছিল, 'যদি এমন কোন মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম ঘটে, তাহলে নিশ্চিত বিয়ে করতে পারি। এবং সময় এলে আমি তা করে দেখাবো।'

ট্রেন এসে পড়তে সে লখনৌ ফিরে গেল।

তারপর, অল ইন্ডিয়া ডিবেটে তার সঙ্গে বেনারসে দেখা হল। আমরা দুজনে সারনাথ স্তূপে বেড়িয়ে এলাম। মহাত্মা বুদ্ধের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করছিল, বলল—যদি ধর্ম ও সংস্কার ব্যাপারে বিব্রত না হতাম, তাহলে নিশ্চিত বুদ্ধের আশ্রয় নিতাম।

'জানো, মহাত্মা বুদ্ধের জীবনাবসান কি ভাবে ঘটেছে?' মিউজিয়ামে

মহাত্মা বুদ্ধের শান্ত-সমাহিত এবং স্মিতহাস্য মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে বলেছিল, 'মহাত্মা বুদ্ধ একদা এক দরিদ্র অস্পৃশ্যের গৃহে ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিলেন। বেচারীর গৃহে তখন পচা শুয়োরের মাংস আর কিছু অবশেষ নেই, তাই এনে প্রভু বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রে দান করল। মাংস পচে যাবার ফলে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল, তা জেনেও প্রভু সেই মাংস ভক্ষণ করলেন। প্রাণ উৎসর্গ করলেন, তবুও কোন দরিদ্র অস্পৃশ্যের হৃদয় নিরাশায় ভাঙ্গলেন না।'

. এই সব আলোচনা করতে করতে যখন আমরা টাঙ্গায় করে শহরে ফিরছিলাম, তখন দেয়ালে 'দেবদাসের' পোস্টার দেখে বিরজু বলে উঠেছিল—'অথচ, দেবদাসকে দেখো, বেচারী পার্বতীকে মাঝনদীতে ত্যাগ করল, ওদিকে আবার চন্দ্রমুখীর হৃদয়ও ভেঙ্গে দিয়েছিল। বেচারা মদের সমুদ্রে ডুবে গেল, অথচ সেই সমাজ—যা মনুষ্যের মাঝে গভীর খাদ সৃষ্টি করেছিল—অতিক্রম করতে পারল না।'

আমি বললাম, 'দেবদাস তো আর কোন কল্পিত ফিল্ম-নায়ক নয়। শরৎবাবু একজন সাধারণ লোকের চরিত্র এঁকেছেন, সমাজের সামনে তোমার-আমার মত সেও অসহায় দুর্বল ছিল।'

তখন সে বলে উঠল, 'সে তোমার মত অসহায় দুর্বল হতে পারে, কিন্তু এমন পরিস্থিতি যদি আমার সামনে এসে হাজির হয়, তাহলে নিশ্চিত আমি দুর্বল প্রমাণিত হবো না।'

সে রাতেই আমাদের বেনারস থেকে বিদায় নেবার পালা। আমাদের ট্রেন মাঝ রাতে। রাত দেড়টায় আমার ট্রেন, বিরজুর পোনে তিনটে নাগাদ। ডিবেট উপলক্ষে অন্যান্য য়ুনিভার্সিটির যে সব ছাত্ররা এসেছিল, তারা সকলেই চলে গিয়েছিল। কেবল আমি আর বিরজুই ছিলাম, এবং আমাদের দেখা-শুনার জন্য বেনারস য়ুনিভার্সিটির একজন এম. এ. ছাত্র ছিল—গোবিন্দ সাক্সেনা।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা কথা বলছিলাম, এমন সময় গোবিন্দ প্রস্তাব দিল, 'ট্রেন আসতে এখনও কয়েক ঘণ্টা দেরী, বরং চলুন আপনাদের গান শুনিয়ে আনি।'

আমি তখনও কোন বাঈজীর গান শুনি নি। বেনারসের গায়িকাদের সুনাম ও প্রশংসা শুনেছিলাম—উচ্চাঙ্গ, দাদরা, ঠুমরির কোন তুলনাই হয় না। বললাম—গুড আইডিয়া। চলো, বিরজু।'

কিন্তু সে বলল, 'বাদ দাও, এখানে বসেই তো বেশ গল্প-গুজব করছি। সেখানে হয়তো গিয়ে দেখবে কোন মোটা, কালো, ধুমসি বাঈজী পান খেয়ে

চিবিয়ে-চিবিয়ে গান শোনাবে, শেষে আমরা 'বোর' হব।'

কথা শুনে গোবিন্দ বলল, 'তোমরা লখনৌ-এর লোকেরা ভাবো, লখনৌর বাইরে বুঝি কোন সৌন্দর্য নেই। আ-রে একবার যদি লক্ষ্মীকে দেখো, হলপ করে বলতে পারি, লখনৌর সৌন্দর্য-পিপাসুদের মিছিল বেরিয়ে পড়বে।'

কিন্তু বিরজু সমর্থন করল না, 'তোমার লক্ষ্মীবাঈ বেনারসবাসীদের কাছে মুবারক থাক। সত্যি বলতে কি, এসব বাঈজীদের গান শোনার কোন কৌতূহল বা আগ্রহ আমার নেই।'

এবার আমার সুযোগ মিলল, কি হলো সোশ্যাল রিফর্মার মশাই! বাঈজীর বাড়ী যেতে বুঝি ভয় করে?

অতঃপর বিরজুকে বলতেই হলো, "না হে, শয়তানের ঘরে যেতেও আমার ভয় নেই!" তারপর, আমরা টাঙ্গায় চেপে লক্ষ্মীর আস্তানার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

এত বছর পরেও লক্ষ্মীর সেই মুখখানি আমি ভুলতে পারিনি। ছোট, সামান্য মোটা; পেটা শরীর, ঝলসানো ফর্সা নয়, কিন্তু কি উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ; ঘন দীর্ঘ কেশ—দুটো বিনুনীতে বাধা; ডাগর চোখ—ভারি দীর্ঘ টানা-টানা পলক; রক্তিম ওষ্ঠপুট—বিচিত্র এক ধরনের উদাসীন হাসি মাখা; তীক্ষ্ন অথচ সুন্দর পাতলা নাসিকা, তার মাঝে হীরের ছোট একটা নথ। গোবিন্দ আমার কানে-কানে বললো—'জানো, এই নথ খোলার জন্য এক জাগীরদার সাহেব পঞ্চাশ হাজার টাকা অফার করেছে।'

মুজরা শুরু হলো। হ্যাঁ, বিশ্বাস করতে হলো, লক্ষ্মী যেমন সুন্দরী, তার কণ্ঠও তেমনি সুরেলা। ঠুমরির পর দাদরা, দাদরার পর গজল। মাঝে-মাঝে গোবিন্দর ফরমাশে এক-আধটা ফিল্মের গানও হলো। মেহফিলে বহু শ্রোতা, অপলক তৃষ্ণার্ত চোখে লক্ষ্মীকে দেখছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, লক্ষ্মীর চোখ জোড়া বিরজুর দিকে নিবন্ধ।

ধীরে ধীরে মেহফিল ভাঙ্গতে লাগল। পকেট শূন্য করে অনেকে উঠে গেল। শেষাবধি আমরাই রয়ে গেলাম। ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা। বললাম—'আমার গাড়ীর সময় হয়ে এসেছে, এবার ওঠা যাক্ গোবিন্দ।'

গোবিন্দ উঠে দাঁড়াল। বিরজু ওঠার চেষ্টা করতেই লক্ষ্মী তার মেহেদি মাখা ছোট নরম হাতখানি, বিরজুর শক্ত টেনিস খেলার হাতের ওপরে রাখলো, আমার দিব্যি কুমার সাহেব! লখনৌয়ের গাড়ী এখনও দেরী আছে।

অপ্রতিভ, কুণ্ঠিত বিরজু আমার দিকে প্রথমে দেখল। তারপর গোবিন্দের দিকে, শেষে লক্ষ্মীর মুখের দিকে—তখনও মেহেদি মাখা নরম হাতখানি তার হাতের ওপর রাখা। আমার মনে হলো, বিরজু আমার সঙ্গে উঠতে চাইছে, অথচ লক্ষ্মীকেও নিরাশ করতে চাইছে না।

আমি তাকে সন্ধেবেলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ইংরেজীতে বললাম—'দিস মীট ইজ্ পয়েজন্ড্।'

বিরজুও ইংরেজীতেই উত্তর দিল, 'আই ন্যো, বাট বেটার টু টেক পয়েজন-দ্যান হার্ট সামওয়ান্স ফীলিংস্।

'তাহলে আমি চললাম, গোবিন্দ চলো।' কিছুটা বিরক্ত স্বরে আমি বলে উঠলাম। মনে হলো, আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু যেন নোংরা নর্দমায় পড়ে গেছে, এবং তা থেকে উঠতে চাইছে না।

'সামনের বছর আবার লখনৌ-এ ডিবেটে দেখা হবে', বিরজু আমার সঙ্গে সন্ধি করার জন্য যেন বলে উঠল। কিন্তু, আমি কোন জবাব না দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে-মনে বিরজু সম্পর্কে যে ছবি এঁকেছিলাম, তা সেই মুহূর্তে খান্ খান্ করে গুঁড়িয়ে গেল। আশা করিনি, সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা-দাতা বিরজু, মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র পথের সমর্থক বিরজু অবশেষে বেশ্যাসক্ত হবে।

রাগে সর্বশরীর কাঁপছিল। দ্রুত পায়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে নাবছিলাম, হঠাৎ ওপর থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর এল, 'শুনুন!'

ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম—লক্ষ্মী! চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে, উত্তেজনায় তার ঠোঁট জোড়া কাঁপছে।

'আপনার বন্ধুকে ধরে রাখলাম' সে বলল, 'তার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

আমি কোন জবাব না দিয়ে এগোলাম। এবারে তার কণ্ঠস্বর শলাকার মত এসে বিঁধল, 'যাবার আগে অন্ততঃ জেনে যান, আমি ইংরেজী বুঝতে পারি। যদি আমি বিষাক্ত মাংস হয়ে থাকি, তাহলে অন্ততঃ ভেবে দেখবেন আমার জীবনে কে এই বিষ মেশালো।'

আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। চুপচাপ সেখান থেকে চলে এলাম।

* * *

পরের বছর লখনৌ-এ অল ইণ্ডিয়া ডিবেটে হাজির হলাম, এ ঘটনা তখন প্রায় ভুলে গেছি। য়ুনিভার্সিটির স্টুডেণ্ট বেশ্যাবাড়ীতে গানশোনা বা সেখানে সারারাত কাটানোর মধ্যে এমন কোন অসাধারণ ঘটনা নয়, যা নিয়ে বছর ধরে চিন্তা করা চলে। সেই মুহূর্তে বিরজুর আচরণ খুব খারাপ লেগেছিল বটে, কিন্তু এই ভেবে ক্ষমা করেছি যৌবনে এক-আধবার সবারই অল্পবিস্তর পদস্খলন ঘটে।

স্টেশনে সে আমায় রিসিভ করতে এসেছিল। লখনৌ-এ থাকাকালীন তিনটে দিন সে সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে কাটালো। বি. এ. ফার্স্ট ডিবিসনে পাশ করে তখন সে এম. এ.-র ছাত্র। বলল—'মা-বাবার ইচ্ছে আই. সি. এস

এ বসি, কিন্তু আমি সরকারী চাকরি করতে চাই না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে কি করতে চাও ?'

সে বলল, 'এম. এ. পাশ করে কোন ছোটখাট কলেজে লেকচারার হবো, কিংবা এল. এল. বি করে ওকালতি শুরু করবো, নইলে তোমার মত জারনালিস্টের মাঠে নেবে পড়বো।'

সে আমাকে লখনৌ শহর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাল। আমি বুঝতে পারলাম, মেয়েদের মহলে বিরজু কতখানি পরিচিত, প্রিয় ও আকর্ষণীয়।

য়ুনিভার্সিটি য়ুনিয়নের কাফেতে বসে আমরা দুজনে বসে চা খাচ্ছিলাম, করুণা ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা। বলল, শোন বিরজেন্দ্র কুমার, আমাদের বেঙ্গলী ক্লাবের প্রোগ্রামে তুমি নিশ্চয়ই আসছো। গুরুদেবের 'রক্তকরবী মঞ্চস্থ করছি।' বিরজু বলল, 'করুণা, আমার যাওয়া সম্ভব নয়, এ আমার বন্ধু, আলিগড় থেকে এসেছে, তাকে লখনৌ ঘুরে দেখাচ্ছি।' সে বলল—'তোমার ফ্রেন্ডকেও সঙ্গে নিয়ে এসো না, প্লীজ !' যামিনী রায়ের ছবির মত টানা-টানা চোখে কেবল রঙ ঝরে পড়ছিল।

সেখান থেকে সে আমায় লাইব্রেরী দেখাবার জন্য নিয়ে গেল। পথে সরলা মাথুরের সঙ্গে দেখা, কবি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করার জন্য বিরজুর খোঁজ করছিল। বলল, 'বিরজেন্দ্র, একটা নতুন কবিতা লিখেছি, পড়ে দেখ কেমন হয়েছে—কবি সম্মেলনে এ কবিতাটাই আমি পড়বো।' সে চলে যাবার পর বিরজু আমাকে কবিতাটি দেখাল। কবিতার শিরোনাম 'আমার স্বপ্ন'। দু-এক পংক্তি পড়ে বুঝতে অসুবিধে হল না তার যাবতীয় স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু বিরজু।

মে-ফেয়র রেঁস্তোরায় চা খেতে গেছিলাম, সহসা একটি সুন্দরী স্মার্ট মেয়ে 'হ্যালো বিরজু' বলে ছুটে এল। বিরজু তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল—মোহনা যশপাল সিংহ। দেখতে পেলাম তার কাজল-টানা চোখ দুটিতে বিচিত্র আলো ঝল্‌সে উঠল। কেন জানি, সেই ক্ষুধার্ত, উজ্জ্বল চোখ জোড়া দেখে ভয় লাগল।

সন্ধ্যের সময় টেনিস ক্লাবে আশা সাক্সেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তার প্রবল ইচ্ছে, টেনিসে মিক্স ডাবল-এ বিরজু তার পার্টনার হোক। সেই সুবাদে তাকে 'পার্টনার-পার্টনার' বলে ডাকছিল। তার ব্যবহারে স্পষ্ট ধরা পড়ছিল, আজীবন তাকে পার্টনার করতে কোন আপত্তি নেই।

পরদিন বিরজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাইরি, তুমি কম ভাগ্যবান নও। এতগুলো মেয়ে তোমার পেছনে লেগে আছে, অথচ এখনও জানা গেল না কার ওপর তোমার বেশী দুর্বলতা, না কি সবার সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়াচ্ছ ?'

সে বলল, 'যার ওপর আমার দুর্বলতা, অর্থাৎ যাকে আমি ভালবাসি—

সে অন্য মেয়ে। তার সঙ্গে আমি ফ্লার্ট করি না। খুব শীগগির তাকে বিয়ে করছি।'

আমি বললাম, সুসংবাদ! এতসব সুন্দরী স্মার্ট মেয়েদের বাদ দিয়ে যদি অন্য কাউকে ভালবেসে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই সে বিশেষ গুণী হতে বাধ্য। তার সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দিলে না যে।

সে হেসে বলল, 'বিশেষ তো বটেই, তাই তাকে পর্দার আড়ালে রেখে এসেছি।'

আমিও হেসে বললাম—'আমাদের মত মুসাফিরের কাছে আবার পর্দার আড়াল কিসের? আমি তো আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই।'

"তাহলে আজ পাঁচটার সময় মেফেয়ার রেস্তোরায় চা খেতে এসো। তার সঙ্গেও আলাপ হবে।'

'কার সঙ্গে? মোহনা যশপালের সঙ্গে?'

'নাহ্, মোহনা একটা বোর! যদিও আমার মা বাবা তার সঙ্গেই বিয়ে দিতে চান, কারণ সে এক জাগীরদারের মেয়ে। কিন্তু যার সঙ্গে তোমায় আলাপ করিয়ে দেবো, সে আলাদা মেয়ে, তার সঙ্গে আলাপ করে দেখো।'

বিকেল চারটে নাগাদ মে-ফেয়ারে ঢুকে দেখলাম, এক কোণে টেবিল ঘেঁষে শ্বেতশুভ্র সাড়ি পরনে একজন মহিলা বসে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, আমি এগিয়ে গেলাম।

'তোমার সঙ্গে ইতিপূর্বে আলাপ হয়েছে।' বিরজু কথা বলতেই মহিলা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

লক্ষ্মী।

'নমস্কার!' চোখ জোড়া আনত করে বলল।

'নমস্কার!' আমিও নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে জবাব দিলাম। চেয়ারে বসে অর্কেষ্ট্রার সিমফনি শুনতে লাগলাম।

সে রাত্রেই গোমতীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে বিরজুর সঙ্গে এ ব্যাপারে কয়েক ঘণ্টা আলোচনা হলো!

বললাম, 'বিরজু, তুমি কি পাগল হলে নাকি? মোহনা যশপাল সিংহ, আশা সাক্সেনা, করুণা ব্যানার্জী, সরলা মাথুরের মত শিক্ষিত, উচ্চবংশের মেয়েদের ছেড়ে কিনা শেষে একটা বেশ্যাকে বিয়ে করছো?

'লক্ষ্মী বেশ্যা নয়।' রাগে উত্তেজনায় সে বলে উঠল।

'মানলাম বেশ্যা নয়, কিন্তু বেশ্যার মেয়ে বটে! তাছাড়া তার মাঝে তুমি এমন কি দেখতে পেলে যে আর সব মেয়েদের বাদ দিয়ে তাকে পছন্দ করে বসলে?'

'একটাই মাত্র কারণ বন্ধু! আমি ওকে ভালবাসি, এবং সেও আমাকে

ভালবাসে। আমার জন্য সে তার আত্মীয়-স্বজন, পেশা-ধর্ম অতীত সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছে। সামনের মাসেই আমাদের দুজনের বিয়ে।'

'তুমি ভাবছ, তোমার অভিভাবকরা তোমার এই বোকামিতে সহজেই অনুমতি দেবেন ?'

'তাঁদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। জীবনের এ রকম সিদ্ধান্তে—কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই—বাবা-মা বা বন্ধু-বান্ধব কারো নয়।'

'ধন্যবাদ!' আমি শক্ত গলায় বললাম, 'তাহলে এসব আমাকে শোনানোর দরকার কিসের ?'

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে পড়ে, আমার কাঁধে হাত রেখে বলল ; 'ভাই! তোমার অনুমতি নয়—তোমার প্রীতি-ভালবাসা চাই। বন্ধু বিচারক হয়ে বন্ধুর আচরণের খোঁজ-খবর নেয় না, তাকে প্রীতির ছায়ায় আশ্রয় দেয়।'

এরপর আমার কিছু বলা প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। শুধু তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে, এবার তুমি কি করবে ?'

সে বলল, 'কাল আমি বাড়ী যাচ্ছি, মা-বাবাকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাবো। মা রোগে ভুগছেন, তাকে চিঠি লিখে শক দেয়ার চেয়ে গিয়ে মৌখিক বুঝিয়ে দেবো।'

'যদি তাঁরা রাজী না হন, তাহলে ?'

'তাহলে তাঁদের ইচ্ছে ও সম্মতি ছাড়াই বিয়ে হবে।'

তার কথা বলার ভঙ্গিতে অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল, আমি নিরুত্তর রইলাম।

পরদিন আমরা একসঙ্গে স্টেশনে গেলাম। তার ট্রেন প্রথমে ছাড়বে, আমার ট্রেন পরে। টিকিট কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'একটা ফার্স্ট ক্লাস শ্যামনগর—' বুকিং ক্লার্ক জিজ্ঞেস করল—'সিঙ্গল, না রিটার্ন ?'

'রিটার্ন', সে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, সব সময় ফেরার টিকিট নেয়া উচিৎ।'

লক্ষ্মীও তাকে স্টেশনে সী-অফ করতে এসেছিল। গার্ড বাঁশী বাজায়, সবুজ নিশান ওড়াতে লাগল, বিরজু তার কমপার্টমেণ্টে উঠে দাঁড়াল, লক্ষ্মীর চোখ জোড়ায় অশ্রু ভরে উঠল।

'পাগলি মেয়ে, একটুও ভাববে না।'

গাড়ী চলতে শুরু করেছিল, বিরজু চেঁচিয়ে বলে উঠল—'আমি পরশু ফিরে আসছি। তিনদিনের রিটার্ন টিকিট রয়েছে।'

গাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয়েছিল। দরজায় বিরজু দাঁড়িয়ে—হাতে সবুজ রঙের একটা রিটার্ন টিকিট। কিছুদূর এগোতেই ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় সমস্ত ট্রেনখানা ডুবে গেল। এখন আর ট্রেন দেখা যাচ্ছিল না, বিরজু নয়, তার সেই রিটার্ন টিকিটও অদৃশ্য হল। প্লাটফর্মের ওপর শুধু লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে, তার চোখে অশ্রু, সেই অশ্রুতে প্রিয়তমের বিচ্ছেদের দুঃখ এবং পুনর্মিলনের

প্রার্থনা ও আশা-আকাঙখা মিশে ছিল।

পরের ট্রেনে আমি আলীগড় ফিরে এলাম। এসেই পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরী করতে ব্যস্ত হলাম।

মাস কয়েক বিরজুর চিঠির প্রত্যাশা করতে থাকি, কিন্তু কোন চিঠি এল না। ভাবলাম, নতুন বিয়ে, হয়তো হনিমুনে কোথাও বেরিয়ে পড়েছে। তারপর, পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সব কিছু ভুলতে হলো। পরীক্ষা শেষে চাকরি নিয়ে বোম্বাই এলাম। নতুন-নতুন কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে আলীগড়-লখনো, বিরজু-লক্ষ্মী, সব পুরনো কথা শেষাবধি স্মৃতি হয়ে হারিয়ে গেল। ১৯৪২-এর আন্দোলন···১৯৪৬-এ দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন-খারাপি···১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন···আমি এর মধ্যে বার কয়েক বিদেশ ভ্রমণ করলাম। জীবনে বহু আনন্দ ও দুঃখ-বাতাসের বেগে এল, বেরিয়ে গেল। কত সাফল্য, তার চেয়ে বেশী অসাফল্য, এবং অনর্থক বিব্রতে নাকাল হতে হলো···তবুও বিরজু-লক্ষ্মীর স্মৃতি মনের কোঠায় এক কোণে পড়ে রইল··· আজ সকালে টেলিফোনের ঘণ্টি বেজে উঠতে, সেসব প্রশ্ন দিনদুপুরে ভুতের মত আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

* * *

এবারকার ঘণ্টি টেলিফোনের নয়। দরজা খুলতেই দেখি, আধময়লা ঢিলেঢালা বুশসার্ট ও প্যাণ্ট পরণে একজন প্রৌঢ় গোছের লোক দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মোটা লেন্সের চশমার ফাঁক দিয়ে আমায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। ইন্সুরেন্স এজেণ্টদের মত তার হাতে একটা প্লাস্টিকের পোর্টফোলিও। পঁচিশ বছর পর আজ যখন বিরজুর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা—সেই সময় কোত্থেকে এক ইন্সুরেন্সের এজেণ্ট এসে হাজির।

'কি দরকার ?' কিছুটা বিরক্তিতেই আমি জিজ্ঞেস করি।

কুঞ্চিত তামাটে মুখে একটা হাল্কা-হাসির রেখা দেখা দেয়।

'চিনতে পারলে না ?'

'বিরজু ?'

পরমুহূর্তে আমরা দুজন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরি।

'খুব পালটে গেছি, তাই না ?' সে বসতে বসতে বলে, 'তুমিও চিনতে পারলে না ?'

বস্তুত পঁচিশ বছর বাদে সেই বিরজুর সঙ্গে এখনকার প্রৌঢ়ের চেহারায় সামান্য মিল নেই। ভাবলাম, হয়তো কোন কঠিন রোগে ভুগছে, তাই শরীরের চামড়ার বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে—গায়ের প্যাণ্ট-শার্টের মতই। আমি কিছুটা উৎসাহে বলি, 'পঁচিশ বছরে আমরা সবাই বদলে গেছি। আমার দিকে চেয়ে দেখো, মাথায় বেশ বিরাট টাক পড়েছে।'

সে বলে, 'টেলিফোন ডায়ারেক্টরী থেকে তোমার নাম খুঁজে বার করেছি। আশা করিনি, তোমার সঙ্গে দেখা হবে, শুনেছি, অধিকাংশ সময় তুমি ভারতের বাইরে থাকো।

টেলিফোনের প্রসঙ্গে আমি বলি—'ফোনে তোমার গলার স্বর শুনে ভেবেছিলাম কোন ইংরেজ বা আমেরিকান ফোন করছে—বিদেশ ভ্রমণে হয়তো কোথাও তার সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকবে।'

'ওটা আমার অ্যাকসেণ্ট! অনেকদিন আমি বিদেশেই কাটিয়েছি, তাই এমন অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

কেন জানি মনে হয়, সে যেন কিছু বলতে চায়, সেই সঙ্গে লুকোতেও চায়।

নানান ধরনের চিন্তা এবং সম্ভাবনা আমার মনে ঘুরপাক খায়।

হয়তো ওর চাকরি গেছে, বেকার বসে আছে···সম্ভবতঃ কিছু সাহায্য চায়।···হয়তো মদের নেশায় ডুবে গেছে, তাই তাকে কিছুটা 'অস্বাভাবিক' মনে হচ্ছে, হাতের আঙ্গুল কাঁপছে···হয়তো কোন অপরাধ করে থাকবে, তাই তার চোখ জোড়ায় ত্রস্ত চাহনি, ইতঃস্তত দেখছে···কিছুক্ষণ আমরা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে অতীত খুঁজতে থাকি।

এবার আমি বলি, 'বোম্বাইয়ে একা এসেছো? বৌদি সঙ্গে নেই বুঝি?'

তার উত্তর আমাকে আশ্চর্য-বিস্মিত করে, 'আমি ডাইভোর্স করে দিয়েছি।' এতক্ষণে তার বিক্ষিপ্ত মনের কথা বোঝা গেল। এতদিন বাদে যখন কোন গভীর ভালবাসা ডাইভোর্সের পর্যায়ে নেমে আসে, তাহলে মনের এমন অবস্থা হওয়া বিচিত্র নয়।

'খুবই দুঃখিত বিরজু!' আমি বলি, 'কিন্তু, এমন কি ঘটল, যার ফলে তোমায় শেষাবধি ডাইভোর্স কবতে হলো? এই বয়সে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাহায্য অবলম্বনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।'

'স্বামী-স্ত্রী।' শব্দ দুটি তিক্ত ওষুধের মত থুথু করে উচ্চারণ করে, 'প্রথমদিন থেকেই আমাদের বিয়ে একটা প্রহসন, ভয়ানক ভুল। চব্বিশ বছর ধরে আমি এই ভুল বয়ে বেড়িয়েছি। সেই মিথ্যেটাকে সত্য করার জন্য দীর্ঘ চব্বিশ বছর এই ভুলের বোঝা বয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু সফল হতে পারি নি।'

তাকে কি উত্তর দেবো, বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকি। আমার কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। সে আমার কাছে শলা-পরামর্শ করতে আসেনি, বরং মনের জ্বালা মেটাতে এসেছে।

তার হাতের আঙুল কাঁপতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে সে একটা সিগার বার করে। মুখ থেকে ধোঁয়া ছড়িয়ে বলে, 'তুমি হয়তো ভাবছ, এতদিন আমি কোথায় নিরুদ্দেশ ছিলাম। বিয়ের পর বউকে মা-বাবার কাছে রেখে আমি

সোজা ইংল্যান্ডে পাড়ি দিলাম। আই. সি. এস দিলাম, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ করলাম।'

'তুমি আই. সি এস নাকি? কৈ, আমি তো জানি না।'

'আমি কাউকে বলতে চাইনি। তোমরা সে সময় সরকারী চাকরী বয়কট করছিলে, সত্যাগ্রহ করে জেলে যাচ্ছিলে। কোন মুখে আমি আর তোমাদের কাছে হাজির হবো, বলো। জেনে-শুনে এমন এক জায়গা বেছে নিলাম, যেখানে পুরনো কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা বিরল। প্রথম দিকে কয়েক বছর ফ্রন্টিয়ারে, তারপর আসাম, আসামের পর কুর্গ···সেখানেই আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম···'

বহুক্ষণ ধরে সে সিগারেটের ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘে কতই না ছবি গড়ল, ভাঙ্গল।

বলল, "কিন্তু সে আমার ছেলে নয়। যে ছেলে হলো, তা আমার এক চাপরাসির জন্ম দেয়া। আমি যখন প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে পারি, তুমি ধারণা করতে পারো, সে সময় আমার মনের অবস্থা কেমন হয়ে গেছিল। মাসকয়েক আমি একেবারে পাগল হয়ে ছিলাম। মদ আগেও খেতাম, কিন্তু এরপর নিজের লজ্জা আড়াল করার জন্য মাত্রা ছাড়িয়ে গিলতে শুরু করি। হুইস্কিতেও যখন মন ভরল না, তখন কোকেন খেতে শুরু করি। তিনমাস মেন্টাল হসপিটালে চিকিৎসা করিয়েছি, তারপর নিজেকে যখন কোনরকমে সামাল দিতে পেরেছি, বাইরে বেরিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হলো। দুর্নাম দিয়ে বার করে দেয়ার চেয়ে, বরং ভাল মনে করি, রোগের কথা উল্লেখ করে সময়ের অনেক আগেই পেন্সনের জন্য দরখাস্ত করি। ওকে বহুবার মিনতি করেছি, আমায় ত্যাগ কর, বরং ছেলেটাকে সঙ্গে নাও। আমার পেন্সনের সব টাকা নাও। দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও, আমি যেন আবার নতুন জীবন শুরু করতে পারি। কিন্তু ও বললো, তুমি আমার জীবনটাকে নষ্ট করেছ। এত সহজেই কি তুমি নিষ্কৃতি পাবে?"

'তারপর?' আমি ধীর স্বরে প্রশ্ন করি।

'তারপর···আমি ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাই। ভারতে আর কারো কাছে মুখ দেখাবার মত অবস্থা ছিল না। পেন্সন বিক্রী করে যত টাকা পেলাম, তা দিয়ে লণ্ডনে একটা বাড়ী কিনলাম। একটা অংশে আমরা থাকতাম, অন্য অংশে ভারতীয় বা আমেরিকান ছাত্রদের ভাড়া দিতাম। সেটা আমাদের জীবিকার একমাত্র উপায় ছিল।

'তারপর?'

'তারপর সেই পুরনো কাহিনী। এখন আমার মাঝে তেমন শক্তি আর নেই যে ওই চরিত্রহীনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করি। রাত্রে যতক্ষণ না 'পান'

বন্ধ হয়, আমি বসে-বসে মদ গিলি, আর ঐ সময় সে ভাড়াটে যুবক-ছাত্রদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে।...দশ বছরে তার তিনটে সন্তান—প্রথমটি একেবারে কালো, মাঝেরটি শ্যামবর্ণের এবং শেষেরটি ফর্সা ফুটফুটে।”

বন্ধুর ওপর আমার যেমন সহানুভূতি জেগেছে, তেমনি প্রচণ্ড রাগও। শেষে আমি আর থাকতে পারি না, বলেই ফেলি—‘শেষকালে তুমিও মেনিমুখোব মত চুপ করে এসব সহ্য করলে, পারলে না ঐ ছেনালিটার দু’গালে জুতো কষিয়ে দিতে। চব্বিশ বছর আগেও আমি তোমায় বলেছিলাম, বিরজু, বেশ্যার মেয়েকে গ্রহণ করে হতাশা ও অশান্তি ছাড়া তুমি আর কিছু পাবে না।’

‘বেশ্যার মেয়ে?’ সে বিস্ময়ে কথাটা আওড়ায়।

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ বেশ্যার মেয়ে, লক্ষ্মী।’ ঘৃণাস্বরে আমি সে নাম উচ্চারণ করি। এতক্ষণ আমাদের উভয়ের মাঝে যা ধাঁধা হয়ে ছিল, যা উপলব্ধী করার শক্তি আমার মাঝে ছিল না, বিরজুর মাঝেও।

‘লক্ষ্মী।’ নামটা এমনভাবে আওড়ায়, যেন জীবনে এই প্রথম শোনে। পরমুহূর্তে লাগামছাড়া হাসিতে ফেটে পড়ে। হাসতে থাকে। হাসির স্রোতের পর স্রোত। তার মুখ দিয়ে হাসির স্রোত বেরিয়ে আসে, সে হাসিতে আনন্দ নয়, বরং এক ধরনের ব্যর্থতার হাহাকার। আশ্চর্য, বিস্ময়ে আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

‘তুমি ভেবেছো বুঝি এতক্ষণ ধরে আমি লক্ষ্মীর কথা বলছিলাম।

‘তবে কার কথা?’ আমি বলি, ‘ওকেই তো তুমি বিয়ে করেছিলে, তাই না?’

‘হায়, যদি এমনটি হতো।’ সে একটা দীর্ঘ হিমশীতল নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ‘আমার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল, সে বেশ্যার মেয়ে—লক্ষ্মী নয়; সে এক জাগীরদারের মেয়ে—মোহনা।’

‘মোহনা?’ লখনৌ-এর মে-ফেয়র রেস্তোরায় তাকে দেখেছিলাম, তার সুন্দর মুখশ্রী মনে করার চেষ্টা করি। চব্বিশ বছর পরেও আমি যেন দেখতে পাই, কাজল টানা চোখের কোণে এক বিচিত্র আগুনের চমক। সেদিন কি আর জানতাম, এই আগুনেই বিরজুর জীবন একদা ঝলসে যাবে।

‘আর লক্ষ্মী?’ আমি জিজ্ঞেস করি, ‘লক্ষ্মীর কি হলো অবশেষে? শেষবার তোমার সঙ্গে যখন লখনৌয়ে দেখা হলো, বেশ মনে আছে, তুমি তিনদিনের রিটার্ন টিকিট নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলে মা-বাবাকে বিয়ের খবর দিতে।’

উত্তরে সে কিছুই বলে না। পকেট থেকে পুরনো একটা ব্যাগ বার করে, তার ভেতরে ভাঁজ করা কাগজ। এই কাগজের ভাঁজ থেকে রেলওয়ে টিকিটের

অর্দ্ধাংশ বার করে। বহুদিনের, এত জীর্ণ হয়ে গেছে যে ছাপা অক্ষরগুলি সব লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল সাইজ দেখে অনুমান করা যায় কোন সময়ে এটা রিটার্ন টিকিটের অর্দ্ধাংশ ছিল।

ক্রমশঃ আমি কিছু-কিছু বুঝতে পারছি, কি ঘটেছিল।

'তুমি বাড়ীতে গিয়ে নিশ্চিত তোমার মা-বাবা—অর্থাৎ কুমার বাহাদুর মহারাণী কাউকেই রাজী করাতে পার নি? তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়েছিলেন?'

সে মাথা নাড়িয়ে স্বীকার করল হ্যাঁ এমনই ঘটেছিল!

'তাঁরা তোমায় লখনৌ ফিরে যেতে বাধা দিয়েছিলেন?'

সে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল।

'তাঁরা তোমায় জোর করে জাগীরদারের মেয়ে মোহনার সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন? তোমাকে ইংলণ্ড পাঠাবার লোভ দেখান? তোমাকে ভয় দেখান এই বলে যে বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে করলে সমাজে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে। তাতে যে শুধু আই. সি. এস থেকে সরতে হবে তা নয়। কোন ভাল চাকরিও তুমি পাবে না?'

আশ্চর্য বিস্ময়ে তার মুখখানা উন্মুক্ত হয়ে থাকে, 'তুমি এত সব জানলে কি করে?'

আমি বলি—'আমাদের দেশে এমনই হয়ে থাকে—ফিল্মে, জীবনেও। সেসব দিনে এসব আরও বেশী করে হতো। সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়া, জীবনে বিপ্লব আনার চেয়ে ঢের বেশী সহজ কাজ—তখনও ছিল, এখনও আছে।'

'আমার সেই দুর্বলতার পরিণাম আজও আমায় ভুগতে হচ্ছে। মনে আছে, একবার আমি দেবদাসের দুর্বলতা নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলাম।' এসব কথা বলে নিজের মনকে সে প্রলেপ দিতে থাকে।

"তারপর, রিটার্ন টিকিটের তিনদিনের মেয়াদ শেষ হলো, আর তুমিও লখনৌ-এ ফিরে এলে না, তাইতো? তারপর থেকে রিটার্ন টিকিটের অর্ধেক অংশ তোমার পকেটে পকেটে ঘুরছে…"

'হ্যাঁ, বন্ধু, এই হলো ট্রাজেডী!' তার কণ্ঠস্বর ভারি ভেজা-ভেজা মনে হয়, চোখ জোড়া টলটল—'জীবনের যাত্রায় রিটার্ন টিকিট পাওয়া যায় না—যেখান থেকে শুরু করি, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা সেস্থানে ফিরে আসতে পারি না।'

* * *

'তাহলে, এবার কি করতে চাও।' অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি জিজ্ঞেস করি।

বিরজু বলে, 'মোহনাকে আমি লণ্ডনের বাড়ী দিয়েছি। আমার যাবতীয় সম্পত্তিও তার নামে লিখে দিয়েছি। প্রতিদান সে আমায় ডাইভোর্স করতে রাজী হয়েছে।'

'তবে কি মোহনা…মোহনা…কি আগাগোড়া এমনই ছিল ?'

'না। আগে সে এমন ছিল না। পঁচিশ বছর ধরে তার সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছি।'

'তাহলে এমন হলো কি করে ?'

বিরজু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। পকেট থেকে একটা নতুন সিগার বার করে ধরায়। ধীরে ধীরে কয়েকটা টান দেয়। তারপর বলে; 'দোষ আমারই। তার অধিকারের বস্তু তাকে আমি দিতে পারিনি। ভালবাসার চেষ্টা করেও আমি তাকে ভালবাসতে পারিনি।'

'তবে কি সে লক্ষ্মীর সম্পর্কে কিছু জানত ?'

'বিয়ের বছর খানিক বাদে সে সব কিছু জানতে পেরেছিল। তখন আমার পোস্টিং ফ্রন্টিয়রে। একদিন রাত্রে ক্লাব থেকে প্রচণ্ড মদ্যপান করে ফিরেছি। বেডরুমে শুতে যাবার সময় দেখি, চাঁদের আলোয়, সাদা শাড়ি গায়ে লক্ষ্মী আমার খাটের ওপর শুয়ে আছে। আমি এসে তাকে জড়িয়ে ধরি, প্রচণ্ড ভালবাসাবাসি করি, প্রচণ্ড। সে বলে ওঠে, 'বিরজু তুমি কাঁদছ ? কি হয়েছে ?' আমি বলি, কথা দাও, আর তুমি কখনও আমায় ছেড়ে যাবে না। বলো লক্ষ্মী…' কিন্তু সে লক্ষ্মী ছিল না; সে হলো মোহনা—আর, সে রাতের পর মোহনাও আর মোহনা রইল না। আমূল পালটে গেল। প্রথমে সে আমার সঙ্গে মদ্যপান শুরু করে, তারপর অন্যের সঙ্গে। ফলে যা ঘটেছে, তুমি তা শুনলেই। আমি অবশ্য তাকে আর দোষ দিচ্ছি না। আমার এই দুর্দশা, এবং এই দুর্দশার কারণ একমাত্র আমিই।'

'আর লক্ষ্মী ?'

'তার জীবনটাও আমার জন্য নষ্ট হয়ে গেল। আমার ওপর নির্ভরতা যখন হারিয়ে বসল, তাকেও তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে হলো। সেখানে তাকে সে সব কাজ করতে হলো, যা থেকে কেবল আমিই তাকে রক্ষে করতে পারতাম। বেনারস থেকে দিল্লীর চাবড়ি মার্কেটে; সেখান থেকে কলকাতার সোনাগাছি; তারপর বোম্বাইয়ে ফারস রোডে। এখন বয়স হয়েছে, শুনেছি, রোগে ভোগে অকর্মন্য হয়ে বেনারসে ফিরে এসেছে, কোন এক মন্দিরের চাতালে পড়ে থাকে…আর…আর…

'আর কি ?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'আমি তার কাছে যাচ্ছি।'

সেই রাত্রে যখন তাকে তুলে দিতে স্টেশনে যাই। টিকিট কাটতে গিয়ে,

বুকিং ক্লার্ক জিজ্ঞেস করে—'সিঙ্গল না রিটার্ন ?'

বিরজু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে 'সিঙ্গল !'

প্লাটফর্মে হাজির হতে বিরজু বলে, 'এই আমার শেষ যাত্রা।' এবার আর রিটার্ন টিকিটের দরকার নেই।

ট্রেন ছাড়ার আগে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পাই। সেই লোলচর্ম চেহারা, কাঁচাপাকা মিশ্রিত কেশ, প্রৌঢ়কে আর প্রৌঢ় বলে মনে হয় না, তার চেহারায় এক বিচিত্র ধরনের সুখীসুখী ভাব, আনন্দ-উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। চোখ জোড়ায় নতুন জীবনের আলোর ঝিলিক। গলায় দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে···মুহূর্তের জন্য তাকে পঁচিশ বছর আগেকার বিরজু মনে হলো।

আমি বলি, 'বিরজু, লক্ষ্মীবৌদিকে আমার তরফ থেকে শ্রদ্ধা জানিও। আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই, বন্ধু।' আশ্চর্য হয়ে দেখি, সে নব-বিবাহিতের মত লজ্জা পাচ্ছে।

ডেড-লেটার

ডার্লিং !

কি ?

প্রসাদ আজ বিকেলে ব্রীজ ও খাবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করেছে। মনে আছে তো ?

হ্যাঁ !

অফিস থেকে আমি সাড়ে পাঁচটায় ফিরবো। তুমি তৈরী থেকো।

আচ্ছা !

আচ্ছা ! আচ্ছা ! আচ্ছা ! বারো বছর ধরে কেবল এই একটা শব্দ সে তার স্ত্রীর মুখ থেকে শুনে আসছে। দশটি কথার মধ্যে নয়টি কথার উত্তর শুধু আচ্ছা বলে শেষ করে। যেন বুলি-শেখা ময়না কেবল একটি পরিচিত বুলি আওড়ায়—আচ্ছা। আচ্ছা !

সুধীর সাক্সেনা, আই. সি. এস, ডেপুটি কমিশনার, জেলা নারায়ণগঞ্জ। তাঁর সম্পর্কে সকলের একটি মাত্র ধারণা, পৃথিবীতে তাঁর মত সৌভাগ্যবান কেউ নেই। উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন, ভাল বেতন, বসবাসের জন্য আরামপ্রদ গৃহ, বিমলার মত রুচিসম্পন্ন, সুশিক্ষিতা, পরিশীলিতা স্ত্রী—কমিশনারের সঙ্গে যে ব্রীজ খেলতে পারে, রামনগর রাজাসাহেবের সঙ্গে ডান্স করতে পারে এবং তিনটি সুন্দর সপ্রতিভ সন্তানের জননী। সর্বজ্যেষ্ঠ রণবীর—দশ বছর বয়স, নৈনিতাল ইংরাজী স্কুলে জুনিয়ার কেম্বিজের ছাত্র, সেই সঙ্গে ক্লাশের ক্রিকেট-টিমের ক্যাপটেন। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেদের মত ফুরফুরে ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। মধ্যম সন্তান সপ্তম বর্ষীয়া ঊষা—মা'র মতই শীর্ণকায়া, নরম শরীর, ডাগর আঁখিজোড়া এবং ঠিক মা'র মতই মাথা জুড়ে সোনালী চুল। নারায়ণগঞ্জেও একটি কনভেন্টের সে এখন থার্ড স্টাণ্ডার্ডের ছাত্রী, নার্সারী রাইম্সের যাবতীয় ছড়া তার মুখস্থ, এবং 'টুইংকিল্ টুইংকিল্ লিটল্ স্টার' জাতীয় ছড়া সে মুখে মুখে গেয়ে শোনায়। সর্বকনিষ্ঠা শান্তি—সে এখন তিন বছরের মেয়ে, এবং আদর করে বেবী নামে ডাকা হয়। মা-বাবা দুজনেরই নয়নের মণি। আধো আধো গলায়, মিষ্টি স্বরে 'ড্যা-ড-ডি, টা-টা, মাম্মি, বাই-বাই,' ডাক শিখেছে।

সকলেই সুধীর সাকসেনা আই. সি. এস কে অত্যধিক সৌভাগ্যবান মনে করে, এবং সে নিজেও মাঝে-মাঝে এটা ভাবতো। যা কিছু তার প্রাপ্য,

তার বেশী সে জীবনে আর কিই বা আশা করতে পারে? তবুও, সে স্ত্রীর মুখে কেবল 'আচ্ছা' এই শব্দই শুনে এসেছে—বিমলার ফ্যাকাশে, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল, শ্রান্ত-ক্লান্ত কণ্ঠে। তখন সৌভাগ্য ও আনন্দ—দুটোর প্রতি সুধীরের সন্দেহ জাগে, মনের মাঝে চূড়ান্ত হতাশার মেঘ ছেয়ে যায়।

আচ্ছা।

কে জানে কবে থেকে এ শব্দ সে জীবনে আউড়ে চলেছে।

* * *

বারো বছর আগে, তাদের দুজনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল মুসৌরীতে। মাস খানেক আগে সুধীর ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছে, কাজে যোগ দেবার আগে সপ্তাহ কয়েক ছুটি কাটাতে সে মুসৌরীতে এসেছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের সুন্দরী, সুসজ্জিতা, ও আকর্ষণীয় রমণীদের ভিড়ে মুসৌরী তখন সরগরম। লাইব্রেরীর সামনে প্রতিটি সন্ধ্যায় রঙীন শাড়ির ঝলসানি, আঁটো কামিজ, সিল্কের সালোয়ার এবং গলায় জড়ানো দুপাট্টার এক্সীবিশন সৃষ্টি হতো। হিলতোলা জুতোর আকর্ষণীয় চলার গতি, দ্বিধাহীন দৃষ্টিপাত, তপ্ত যৌবন, আবেদনময়ী নিতম্ব, রঙীন ওষ্ঠে, সরু টানাটানা ভ্রূ, পাউডার উপচে-পড়া কপোল, পার্ম করা কেশগুচ্ছ। প্রতিটি তরুণের কাছে ছিল এসব দেখার মুক্ত আমন্ত্রণ। কিন্তু, কেন জানি, মুসৌরীতে সুধীরের চোখে একটি মাত্র মুখশ্রী পছন্দ হল, এবং সে বিমলা—যার সঙ্গে প্রথম দর্শন ও আলাপ ঘটেছিল, হ্যাকম্যানস্ হোটেলের এক সান্ধ্য টি-ড্যান্সের অনুষ্ঠানে।

'হ্যালো সুধীর!' পাটনার বন্ধু মিঃ মাথুর হাতছানি দিয়ে তাকে টেবিলের দিকে আসার জন্য ডাকে, 'এদিকে এসো! এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।...ইনি হলেন বিমলা ব্যানার্জি। যদিও বাঙালী, কিন্তু লক্ষ্মৌর বাসিন্দা। সেখানে একটি কলেজে পড়েন।

সুধীর দেখলো, পাউডারহীন রক্তিম মুখশ্রী-মাঝে একজোড়া ডাগর চোখ, যার গভীরতায় কোন দুঃখ নিমজ্জিত। চোখের কোলে কালো রেখার আভাস। সরু, লজ্জাকাতর আঁখিপল্লব—যা রাত্রিজাগরণ ক্লান্ত আঁখি-পাতার ভারে ক্রমশঃ নেমে আসছিল।

মাথুরের অনুরোধ ছাড়াই সে বিমলার পাশের চেয়ারে বসে পড়ে। তারপর, সে আবিষ্কার করে, ব্যস্ত কোলাহলমুখর বলরুমে বিমলা ছাড়া তার পাশে আর কেউ নেই।

সুদীর্ঘ বারো বছর পরে, আজও তার মনে সেদিনের প্রথম আলাপের খুঁটিনাটির স্মৃতি টাটকা আছে।

আপনি সম্ভবতঃ আই. টি. কলেজে পড়েন?

হ্যাঁ।

বি. এ. ?

হ্যাঁ।

আসছে বছর ফাইনাল পরীক্ষা দেবেন ?

দীর্ঘ দুটি বছর ধরে ইংরেজ রমণীদের সংস্পর্শে কর্কশ পুরুষালি কণ্ঠস্বর শুনে, তারপর দুটি সপ্তাহ মুসৌরীর কোলাহলে কাটাবার পর অপূর্ব এক ধরনের শান্ত-নীরবতা আবিষ্কার করল বিমলার সংক্ষিপ্ত কথাবার্তায়। যেন, তুফান, আঁধি ও বজ্রের গুরুগম্ভীর নিনাদের পর বৃষ্টিপাত থেমে গেছে, গোলাপ-কুঁড়ির গা বেয়ে ছোট ছোট জলবিন্দু চুঁয়ে পড়ছে ঘাসের ওপর ! অদ্ভুত আন্তরিকতা তার ঐ সংক্ষিপ্ত 'হ্যাঁ' শব্দে। এক ধরনের কোমলতা, মিষ্টতা অপূর্ব পবিত্রতা ও লজ্জার সমন্বয় ঘটেছে।

আপনি ডান্স করেন ?

না।

তার বন্ধু ততক্ষণে ডান্সের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। তারা দুজন তখন টেবিল ঘেঁষে একা বসে আছে। সুধীর ভাবল, তার অন্বেষণ বুঝি আজ শেষ হল। বিমলার চেয়ে উপযুক্ত স্ত্রী পাওয়া অসম্ভব। সুন্দরী বটে, তা বলে মধুপায়ী প্রজাপতি নয়—এক ফুল ছেড়ে অন্য ফুলের দিকে ঘুরে বেড়ায় না ! শিক্ষিত নারী, নিজের ধারণা জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-সংকোচ নেই, অথচ মুখে তেমন প্রগলভতা নেই। অভিজাত ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়, তা বলে এমন ধনী নয় যে একজন আই. এস. এর প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দেবে। তার সঙ্গে বিয়ে করে বস্তুতঃ সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে।

সুধীর বলে, তাহলে আপনার বাবা··· ।

তিনি লক্ষ্নৌয়ে থাকেন। আর্ট স্কুলে পড়ান।

'ওঃ, আপনি তাহলে আর্টিস্ট ব্যানার্জীর মেয়ে ! তাঁর ছবির এক্সীবিশান আমাদের পাটনায় একবার হয়েছিল।' পরক্ষণেই সে সরাসরি অতিসহজে সাবলীল মিথ্যে কথা বলে ফেলে—'তাঁর ছবি আমার দারুণ ভাল লেগেছিল।' যদিও, সে সময় সুধীরের মনে হয়েছিল এইসব আঁকা-বাকা রেখায়, লাল-নীল রঙের সংমিশ্রণে কি যে ছাতামাথা আর্ট সৃষ্টি হয়েছে—কেন যে লোকেরা এত বেশী প্রশংসা করে ? এই মুহূর্তে তার একটি ছবির কথা বিশেষ করে মনে পড়ল, এগারো বছরের একটি চঞ্চল, চপল মেয়ের ছবি, সাবান গোলা জলে রঙীন ফানুস তৈরী করে আকাশে ওড়াচ্ছিল। ছবির অ্যাকশন—ফানুস।

আচ্ছা, সেই 'ফানুস' ছবিতে কি আপনিই ছিলেন ?

হ্যাঁ।

তাতে কিন্তু আপনাকে বড় বেশী চঞ্চল মনে হয়েছিল। এখন যেন আপনি বড় বেশী সিরিয়াস হয়ে গেছেন।

এবার আর শুধু একটিমাত্র শব্দে উত্তর দেয়নি। ক্লান্ত, নিষ্প্রভ, বিচিত্র একধরনের হাসি ঠোঁটে এনে জবাব দেয়—'ফানুসের আয়ু আর কতদিন থাকে? বাতাসের একটা হাল্কা ছাঁটেই, ফানুস ফেটে গেল। শেষ।

এরপর সুধীর যতদিন মুসৌরীতে ছিল, অধিকাংশ সময় কেটেছে বিমলার সঙ্গেই। তারা দুজনে একসঙ্গে চণ্ডালশীর্ষ অব্দি উঠেছিল, একদিন ক্যাম্পটী ফলস্ দেখতেও গিয়েছিল।

* * *

এতদিনে বিমলা খুব বেশী হলেও ডজন খানিক কথা বলেছে তার সঙ্গে। অবশ্য সুধীরের প্রতিটি কথা সে নীরবে, একাগ্রভরে শোনে। কোন প্রশ্ন সরাসরি না করলে, বিমলা কখনও তার মতামত জানায় না। কিন্তু, বিমলার এই কম কথা বলায় সুধীরের কোন অভিযোগ ছিল না। প্রগলভ মেয়েরা, দুনিয়ার প্রতিটি ব্যাপারে মতামত দান করে এবং ধারণা ব্যক্ত করাটা প্রয়োজন মনে করে—সুধীর একেবারেই পছন্দ করে না। বরং তার ভাল লাগে, সে শুধু কথা বলবে, বিমলা বসে-বসে শুধু শুনবে, আর মাঝে-মাঝে হ্যাঁ-হ্যাঁ কথায় জবাব দেবে। সুধীরের যখন ক্রমশ বিশ্বাস হয় যে, প্রকৃতই সে বিমলাকে পছন্দ করেছে, সম্ভবতঃ প্রেম করতে শুরু করেছে—একদিন সুযোগ বুঝে নিরিবিলিতে তাকে 'প্রপোজ' করে বসে।

বিমলা, তুমি কি জান, তোমায় আমার বড্ড ভাল লাগে?

কি?

তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। সত্যি কি তুমি আমায় বিয়ে করবে?

কি! এই কি তার প্রশ্ন এবং উত্তর, দুটোই।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বিমলা বলে, দেখুন, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই আপনাকে প্রতারিত করতে চাই না। আমি আপনাকে ভালবাসি না।

তবে তুমি কি অন্য কাউকে ভালবাস?

বিমলার মুখ থেকে কখনও 'না' শব্দ বের হয়নি, কিন্তু এবার সে সরাসরি জবাব দেয়—না। এবং মুহূর্তখানিক চুপ থাকার পর, হিমশীতল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—না, এমন কেউ নেই।

সুধীর তার কথা বিশ্বাস করে। সে বলে—তা হলে আমার কোন আপত্তি নেই।

সেদিন ছিল ১৪ই জুলাই ১৯৪০।

ডাকবাক্স থেকে চিঠির তোড়া এনে চাকরটা সুধীরের সামনে রাখে। প্রথম যে চিঠিখানি খোলার জন্য তোলে, চিঠির ওপর ডাকঘরের ছাপ নজরে

পড়ে—নারায়ণগঞ্জ, ১৪ই জুলাই ১৯৫২। পরক্ষণেই সুধীরের মনে বারো বছর আগের সেই দিনটি সজীব হয়ে ওঠে। ছুরি দিয়ে খামের মুখ খুলতে-খুলতে সুধীর বিমলাকে জিজ্ঞেস করে,—জান, আজ কি' দিন ?

উঁ ; সঙ্গে সঙ্গে বিমলার দৃষ্টি দেয়ালের গায়ে ক্যালেণ্ডারে গিয়ে থামে।

বারো বছর আগের সেদিনটির কথা কি মনে আছে? যেদিন আমি মুসৌরীতে তোমায় প্রপোজ করেছিলাম ?

হ্যাঁ। কিন্তু এই 'হ্যাঁ' শব্দে শুধুমাত্র স্বীকৃতি, কোন রকম উচ্ছ্বাস বা আনন্দ নেই। বারো বছর আগেকার যে ছাইটাকে সুধীর নাড়াচাড়া করতে চায়, তা একেবারে হিমশীতল। মনে হয়, কস্মিনকালে এতে বুঝি কোন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিল না।

কিন্তু বিমলার মুখে-চোখে রঙের ছায়া-খেলা সুধীরের নজরে পড়ে না। সে তখন চিঠির ভাঁজ খুলে পড়ছে—কলেজের পুরনো ও সপ্রতিভ সতীর্থ মাথুর লিখেছে, এখন সে পাটনায় ওকালতি করছে। চিঠি পড়তে-পড়তে সুধীর মৃদু হেসে ওঠে, মাথুর লিখেছে, ভাই, তুমি খুবই সৌভাগ্যবান! বিমলার মত স্ত্রী পেয়েছ। বুঝলে, অন্ততঃ আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিৎ, যদি না সেদিন আমিই হ্যাকমাংসে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিতাম। কিন্তু ভাই, এই পৃথিবীতে কে কার উপকারের কথা মনে রাখে!

শুনছো, মাথুর কি লিখেছে ?

হুঁ।

বিমলার সম্পর্কে মাথুর যা লিখেছে, সুধীর তা পড়ে শোনায়। তারপর, পরবর্তী চিঠি খোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে কিন্তু দেখল না, মাথুরের বন্ধু-সম্পর্কিত ঠাট্টা শুনে বিমলার চোখে-মুখে কোন খুশীর ঝিলিক দেখা গেল না। কেবল, ঠোঁটে এক বিচিত্র করুণ হাসির ভগ্নাংশ দেখা দিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

অন্য খামটি খুলতেই সুধীর দেখল—ক্লাবের বিল। বিমলার দিকে এগিয়ে দিল সঙ্গে-সঙ্গে, বিল শোধ করার দায়িত্ব তার ওপরে। তৃতীয় চিঠিটি আই. সি. এস. এসোসিয়েশান থেকে এসেছে—বার্ষিক উৎসব এবং সেক্রেটারী মনোনয়ন সম্পর্কে!

শুনছ বিমলা? এ বছর বলদেব, এহসান ওরা সকলেই আমার নাম সেক্রেটারীশীপের জন্য প্রপোজ করতে চায়।

ও!

চতুর্থ খামখানা তোলে। কিন্তু সেটা তার নামে নয়—বিমলার নামে লেখা। মোটা, ভারি এবং হলদেটে, পুরনো ধরনের খাম—তার গায়ে বহু পোষ্টাফিসের ছাপ মারা। বহুবার ঠিকানা কেটে লেখা হয়েছে। 'এ কী ?

মিস্ বিমলা ব্যানার্জী ? এ কি ধরনের অভদ্রতা। মিসেস বিমলা সাক্সেনার বিয়ের বারো বছর কাটিয়ে দেবার পরও 'মিস্' লেখা হয়েছে ?

* * *

এক পলক দৃষ্টি তুলে সুধীর বিমলাকে দেখে। বিমলা তখন চাকরকে দ্বিপ্রহরিক ভোজনের আয়োজন বোঝাচ্ছিল। বিমলা যে তার চিঠি চিনতে পারেনি—এটা স্থির বিশ্বাস হবার পর সুধীর চায়ের পটের আড়াল রেখে খাম খোলে। বিয়ের পর কয়েক বছর বিমলার নামে আসা চিঠি সে লুকিয়ে-চুরিয়ে খুলে পড়েছিল। তাতে কলেজের বন্ধু বা সম্পর্কিত বোন ছাড়া অন্য কারো সন্দেহজনক চিঠি সে আবিষ্কার করেনি। কেন জানি, এই খাম দেখে তার মনে হলো, এতে নিশ্চয়ই পুরানো কোন রহস্য আছে। হয়তো জানা যাবে, এই যে হ্যাঁ, হুঁ, কি, এসকলের বিরক্তীকর, একঘেয়ে ও নিষ্প্রাণ শব্দের আড়ালে কোন অর্থ নিহিত আছে !

খাম থেকে কয়েক পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি বেরিয়ে আসে। প্রথম কয়েকটা বাক্যই সুধীরের মানসিক শান্তি চিরকালের মত নষ্ট করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তাতে লেখা আছে,

প্রাণাধিক বিমলা, প্রিয়তমেষু,

দু মাস পেরিয়ে গেছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার কাছে এই দু মাস দু বছরের চেয়েও দীর্ঘ। আচ্ছা, আমরা কি সর্বদা এরকম লুকোচুরি করে দেখা-সাক্ষাৎ করব ? আমাদের মাঝে যে প্রাচীর আছে, তা কি কখনও ভেঙ্গে ফেলা যায় না ··'

ক্রোধে, ঘৃণায় ও উত্তেজনায় সুধীরের হাত কাঁপতে থাকে। এরপর সে আর চিঠির একটি অক্ষরও পড়তে পারে না। চিঠিটা, তার স্ত্রীর দ্বিচারিণী সম্পর্কে ঘোষণা-পত্র ছিল। দ্রুত হাতে সে চিঠির পাতা উলটে যায়, শেষ পাতায় দৃষ্টি ফেলে। চিঠির শেষে লেখা রয়েছে, তোমারই, শুধু, তোমারই অনিল।

অনিল। তার মগজে অপরিচিত নামের এক বিস্ফোরণ ফাটে।

বিমলা। ক্রোধে সে চেঁচিয়ে ওঠে।

বিমলা তখন ঘরের বাইরে যাচ্ছিল, দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়।

কি ?

কি ! কি ! কি ! সেই মোলায়ম, হিম, নিষ্প্রভ কণ্ঠস্বর ! এই মুহূর্তে সুধীরের মনে হয়, ঐ ছোট শব্দটুকু একটা আভরণ মাত্র, নোংরা গালাগালের মত, যেন একটা চড়,—বিমলা তার মুখে সজোরে আঘাত করেছে।

কি ?

অনিল কে ?

সুধীর প্রশ্নটা এমন আকস্মিক ভাবে করে বসে, বিমলা কিছুক্ষণ হতভম্ব, বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে—যেন সে বুঝতে পারেনি, তাকে কি প্রশ্ন করা হয়েছে। কিন্তু তারপর, ধীরে ধীরে সূর্যের শরীর থেকে যেমন মেঘ সরে যায়, বর্ষার ভিজে রোদ পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে পড়ে—সে রকম ভিজে, ঝকঝকে, মিষ্টি-নম্র হাসি তাঁর চোখে মুখে ফুটে ওঠে।

'অনিল।' মৃদু স্বরে সে নামটি উচ্চারণ করে—যেন জননী তার সন্তানের নামোচ্চারণ করে, যেন ভক্ত তার ঈশ্বরের নাম-গান করে, যেন কবি তার প্রিয় কবিতার পংক্তি গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে। তার চোখ জোড়া এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—সেই আলো, যা বারো বছরেও সুধীর কখনও বিমলার চোখে দেখেনি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনিল? কে সে?' বিমলার চোখে সেই নতুন আলো দেখে সুধীর অস্থির, ছটফট করে ওঠে।

বিমলা যেন অন্য কোন জগতে বাস করছে। তার চোখ দুটি দূরে—সুদূরে—যেন কিছু একটা লক্ষ্য করছে।...সুন্দর, মুগ্ধকর কোন দৃশ্য? কোন মধুর স্মৃতি? আশার কোন আলোককণা?

'সে আমার সর্বস্ব।' তার স্মিত হাস্যমুখর ওষ্ঠজোড়া সুধীরের সঙ্গে নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে কথা বলে। সহসা সেই ওষ্ঠজোড়ায় হাসি নিভে গিয়ে ফুটে ওঠে কটু ভঙ্গিমা 'না, এখন সে কিছুই নয়।' তারপর এক অজানা দুঃখের ব্যথায় তার গ্রীবা আনত হয়ে পড়ে।

রহস্য বাদ দাও। সুধীর চেঁচিয়ে ওঠে। তার ইচ্ছে করছিল, মুহূর্তে টেবিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, চিনেমাটীর যাবতীয় বাসন-পত্র ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়, চায়ের ট্রে-সেট তুলে বিমলার মাথায় আঘাত করে। সত্যি করে বলো, তুমি কি তাকে ভালবাস?

আনত গ্রীবা আবার শক্ত, সোজা হয়ে ওঠে। অশ্রুসিক্ত চোখে আবার সেই আলোর ঝিলিক! ফ্যাকাশে, মাধুর্যহীন স্বরে কেবল 'কি' বা 'হ্যাঁ'—একটি কথায় উত্তরদাত্রী বিমলা সঙ্গে সঙ্গে মাথা তোলে, সুধীরের চোখে-চোখ রাখে। বলে—হ্যাঁ, তোমার ধারনা ঠিক?

সেই মুহূর্তে সুধীরের চোখের সামনে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। তার এখন মনে হয়, বিমলা বুঝি তার সম্মান, আই. সি. এসের সম্ভ্রম, তার পুরুষার্থ—সবকিছুতে চিরকালের জন্য কালি ঢেলে দিয়েছে। তার মনে হলো, বিমলা তাকে এমন নোংরা গালাগাল দিয়েছে, যা আজীবন তার কানে উচ্চারিত হতে থাকবে। তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি, শালীনতা সব কিছুর আবরণ খসে পড়েছে। সে তখন আর বিলেত ফেরৎ ব্যারিস্টার নয়, আই. সি. এস. এসোসিয়েশানের ভাবি সেক্রেটারী নয়, ক্লাবের সর্বজনপ্রিয় সভ্য নয়,

নারায়ণগঞ্জ জেলার ডেপুটি কমিশনার নয়—যার হাতের মুঠোয় লক্ষাধিক প্রাণীর ভাগ্য বাঁধা। এই মুহূর্তে সে সামান্য একজন সর্বশ্রান্ত; রাগে উত্তেজনায় বিব্রত একজন পুরুষ—স্ত্রী যাকে প্রতারণা করেছে।

উন্মাদের মত চেঁচিয়ে ওঠে—বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে! এক্ষুনি! এই মুহূর্তে!

* * *

আশ্চর্য, বিমলার চোখেমুখে কোন রকম ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠে না, দুঃখের ছাপও নয়। সে যেন অন্য কোন জগতে বাস করছে। সুধীরের চিৎকার এমন ভাবে শুনল, যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসা কোন অস্পষ্ট অস্বচ্ছ ডাক। পুনরায় তার ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদু নরম হাস্যরেখা ফুটে ওঠে—পথভ্রান্ত কোন পথিক বহু কষ্টে তার গন্তব্য পথ অন্বেষণ করে পেয়েছে। যেন, বহুদিন যাবৎ, সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে সে এই মুহূর্তখানির প্রতীক্ষা করছিল, অবশেষে সেই শুভ-মুহূর্ত এসে হাজির।

বিমলা কোন উত্তর দিল না। শুধু, মুহূর্তকয়েক চোখ তুলে স্বামীকে দেখল। তার দৃষ্টিতে কোন অনুযোগ নেই—পরিবর্তে দয়া, ক্ষমা। তার চোখজোড়া যেন বলছিল—'এতে তোমার কোন দোষ নেই। তুমি এ ব্যাপারটা বুঝবে না।' তারপর সে ধীর পায়ে বেড-রুমে যায়, বিছানা থেকে ছোট মেয়েকে কোলে তুলে, বারান্দা পেরিয়ে বাইরে চলে যায়। তার পদ-শব্দ ক্রমশঃ দূরে বিলীন হয়ে যায়—অবশেষে বাইরে রাস্তায় জন-কোলাহলে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

সুধীর ভেবেছিল, বিমলা কাঁদবে, মিনতি করবে, নিজের দোষের জন্য ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে নিজের চরিত্র ঠিক রাখার জন্য প্রতিজ্ঞা করবে। কিন্তু, সে ভাবতে পারেনি, বিমলা সত্যি সত্যি গৃহ-ত্যাগ করে চলে যাবে। এই নিঃশব্দ চড়ের আঘাতে তার সমগ্র শরীর-মস্তিষ্ক অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে। হাতুড়ির মত তার মগজে ক্রমাগত একটি শব্দ বার বার আঘাত দিতে থাকে—অনিল! অনিল! অনিল! 'কে এই অনিল? এর খোঁজ আমি বের করবই। একজন বিবাহিত নারীকে পালিয়ে নিয়ে যাবার অপরাধে দায়ী করবো, তাকে জেলে পাঠাবো, একেবারে প্রাণদণ্ড দেবো··· !'

পাগলের মত দৌড়োতে দৌড়োতে সে বিমলার ঘরে গিয়ে ঢোকে। জানা ছিল, ওয়ারড্রোবের ছোট-দেরাজে বিমলা তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি রাখত। চাবির গোছা খাটের ওপর পড়ে আছে। যাবার সময় সে ছুঁড়ে ফেলে গেছে। সুধীর দ্রুত হাতে ওয়াড্রোব খোলে, দেরাজে চাবি এঁটে বাইরে টান দেয়। স্তূপীকৃত সঞ্চিত চিঠির তোড়া ও কাগজপত্র হাতড়াতে থাকে। একেবারে তলার দিকে কাগজের ভাঁজে লাল সিল্কের ফিতে বাঁধা চিঠির তোড়া পেয়ে

যায়। সন্দেহ নেই, এসব অনিলের চিঠি।

হ্যাঁ, তার ধারণা ঠিক। প্রতিটি চিঠিতে, প্রতিটি ছত্রে তার গভীর ভালবাসার অঙ্গীকার ঘোষণা—'বিমলা, আমার প্রিয়তমা।' 'প্রিয়তমেষু বিমলা।' 'আমার নিজস্ব আন্তরিক বিমলা।' 'তোমার, শুধু তোমারই অনিল।' 'এই মরজগতে ও অন্যজগতে তোমার, তোমার শুধু তোমারই।' প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে বিষাক্ত ক্ষুরের মত তার হৃদয় ব্যথাক্ত-রক্তাক্ত করে তোলে। একে একে চিঠিগুলি মেজেতে পড়ছে। কিন্তু, এ কি? চিঠির তোড়ার ভেতরে ভাজ করা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা? খুলে দেখতেই চোখে পড়ে একটি তরুণের ছবি—গভীর, আয়ত, সুদীপ্ত উজ্জ্বল চোখজোড়া, উন্নত ললাট, স্মিত হাস্যমুখর ওষ্ঠ—ঠিক তার তলায় সংবাদ প্রকাশিত ঃ

তরুণ কবির জীবনাবসান

অত্যন্ত গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই, লক্ষ্ণৌর তরুণ প্রতিভাবান প্রগতি-শীল সাহিত্যিক ও বিদ্রোহী কবি অনিল কুমারের সম্প্রতি জীবনাবসান হয়। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কারাবরণ করেছিলেন এবং কারাবাসকালীন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন···

সম্পূর্ণ সংবাদ সে পড়তে পারে না, কারণ সংবাদপত্রের এক কোণে তারিখ মুদ্রিত আছে—১৮ই জুন ১৯৪০।

তার হাত থেকে অন্যান্য চিঠি, সংবাদপত্রের পাতা মেজের ওপর পড়ে যায়। সে বুঝে উঠতে পারে না, ব্যাপারটা কি! অনিল! অনিল! অনিল! মরে গিয়েও কি বেঁচে উঠতে পারে?

পথভ্রান্ত পথিক, সর্বশ্রান্ত জুয়ারীর মত সে খাবার ঘরে ফিরে আসে। টেবিলের ওপর তখনও অনিলের চিঠি ও খাম পড়ে আছে। খামখানি তুলে সে আরেকবার লক্ষ্য করে। সংখ্যাতীত গোলাকার ছাপের মাঝখানে একটি চতুষ্কোণীয় ছাপ আঁকা আছে, তার গায়ে মাত্র তিনটি ইংরেজী অক্ষর জ্বল-জ্বল করে—ডি. এল. ও. (ডেড লেটার অফিস)।

রাতের বোম্বাই

রাতের কালো রেশম বাহুপাশে শুয়ে বোম্বাই হাসছে।

আকাশ বেয়ে নীচে নেমে আসা প্লেনের জানালা থেকে মনে হয়, বোম্বাই শহরের লক্ষ-লক্ষ বাতি, আলো সব 'ক্রমাগত' চোখ টিপছে, দাঁত দেখাচ্ছে, আবার খিল খিল করে হাসছে।

এয়ারপোর্টে একটা বোয়িং নাবছে—নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগেই এসেছে (সিঙ্গাপুর থেকে অনুকূল বাতাস তার গমনে সহায়তা করেছে)। ফলে, দিল্লী থেকে যে ভাইকাউণ্ট এসেছে—তার আর ল্যাণ্ড করার অনুমতি মেলেনি। আটজন যাত্রী নিয়ে ভাইকাউণ্ট বিমান গোটা শহর একবার পরিভ্রমণ সেরে, দ্বিতীয় বারের চেষ্টা করছে। হয়তো তাকে তৃতীয়বার পরিভ্রমণ করতে হবে।

'বোম্বাই টাইম্‌স্' এর চিফ রিপোর্টার অর্জুন চোপরা দিল্লী থেকে রিপাব্লিক-ডে প্যারেড-এর রিপোর্ট নিয়ে ফিরছে, সে তার সামনের যাত্রীকে জানালা দিয়ে বোম্বাইয়ের আলো দেখাতে থাকে। "ঐ দেখুন—সমুদ্রের বুকে নেভির জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হলো গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া, আর ঐ যে তাজমহল হোটেল, তার ঠিক একেবারে সামনেই কোলাবা—দক্ষিণ বোম্বাইয়ের শেষ প্রান্ত। ঐ যে দেখছেন, ঐ হলো মেরিন ড্রাইভ—বোম্বাই শহরের সবচেয়ে সুন্দর সুসজ্জিত রাস্তা—সমুদ্রের ধার ঘেঁষে কয়েক মাইল এগিয়ে গেছে—আর ঐ যে নীচে আলোর ঝলসানি দেখতে পাচ্ছেন—ও হলো চৌপাটি। চৌপাটি সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই শুনে…"

কথা থামিয়ে অর্জুন দেখে, তার সামনে বসা যাত্রীটি জানালা দিয়ে আলো দেখছে না, তার কথাও শুনছে না। তার চোখ জোড়া বোঁজা, হাত দিয়ে সিটের বেল্ট কষে ধরে আছে।

প্রায় প্রতিটি যাত্রা বা ভ্রমণে অর্জুনের সঙ্গে কিছু বিচিত্র ধরনের আকর্ষণীয় লোকের আলাপ পরিচয় ঘটে, কিন্তু এ ধরনের সহযাত্রির দেখা মেলেনি। পালাম বিমান বন্দর থেকে প্লেন তখনও ভাল করে ওড়েনি, বুড়ো তার কোটের ভেতর-পকেট থেকে হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিল বের করে অর্জুনকে দেখায়, জিজ্ঞেস করেছিল—মশাই, ত্রিশ হাজার হবে তো? এই প্রথম বোম্বে যাচ্ছি। দিল্লীর বাজারে আমার সোনা-রুপোর দোকান আছে।

বহুদিন ধরে বোম্বাই যাবো-যাবো ভাবি, কিন্তু কাজ থেকে ফুরসৎ পাই না। গেল বছর সবকটা তীর্থ সেরে এসেছি। ইচ্ছে আছে, মৃত্যুর আগে বোম্বাই দেখে যাব। আমারই উপার্জিত টাকা পয়সায় ছেলে-নাতি সারাটা জীবন ফুর্টুনি-আয়েশ করেছে। আমিও তাই ঠিক করেছি, মাসখানিক বোম্বেতে থেকে ইচ্ছেমত আয়েশ করবো—সারা জীবনের আনন্দ শুদসহ আদায় করে নেবো। শুনেছি, বোম্বাইয়ে নাকি রাত্রে দারুণ ফুর্তি তামাশা চলে··· আর সেই কল্পনায় বুড়োর কুঞ্চিত-স্তিমিত চোখজোড়া চকচকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে পুরু রুক্ষ শুকনা ঠোঁট বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে। এখন তার চোখজোড়া বোজা। সম্ভবতঃ বমি আটকাবার জন্য রুক্ষ শুকনো ঠোঁট জোড়া শক্ত কামড়ে চেপে ধরেছে।

"বেচারা বুড়ো!" অর্জুন ভাবে। 'হয়তো, জীবনে এই প্রথমবার প্লেনে উঠেছে। প্লেন নীচে নাবতে শুরু করলে, অভিজ্ঞ যাত্রীদের পেটেও টান পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গোটা শরীর পাক দিয়ে বমি হতে শুরু করে। বুড়োর অবস্থা নিশ্চয়ই শোচনীয় হয়ে উঠেছে, চোখে-মুখে ক্রমশঃ হলদেটে ভাব ছেয়ে আসছে।

অর্জুন বহুবার প্লেনে যাতায়াত করেছে। তার কখনও বমি হয়নি। কিন্তু আশে-পাশে আরোহীদের বমি করতে দেখে, তার সমস্ত মন-শরীর গুলিয়ে ওঠে। সামনের সহযাত্রির চেহারা হলদেটে হয়ে উঠতে দেখে, সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা সরিয়ে জানালার দিকে রাখে, তারপর নীচে শহরের আলোক-মালা দেখতে থাকে। প্লেন তখনও আকাশে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয়, আকাশের মাঝে শূন্যে সে নিশ্চলভাবে ঝুলছে; নীচে, অনেক দূরে আলো-ঝলমলে শহরটা ক্রমশঃ ঘুরছে···ঘুরে বেড়াচ্ছে।

* * * *

রাত্রি! শহব ঘুরছে, অর্জুন ভালো করে শহরের আলো চেনার চেষ্টা করতে থাকে, ভাবে, "রাত্রি একটি সুন্দরী মায়াবিনী। রোজ সায়াহ্নে শহরকে সে বাহুমাঝে চেপে ধরে, তারপর তারকা-নক্ষত্ররাজির কারুকাজ-করা কালো ওড়না দিয়ে একেবারে ঢেকে রাখে। সকাল পর্যন্ত শহরের যাবতীয় কুশ্রীতা, শহরের শরীরে জমে ওঠা ময়লা, দুর্গন্ধময় কর্দ্দম-ন্যাকরা, হাত-পা চোখে-মুখে রক্ত, পুঁজে থকথকে ঘা ও জখম—সব, ঐ মায়াবি ওড়নার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। তাবৎ অসৎ, অসুন্দর, অন্যায়, পাপ—সব কিছুর ওপর অন্ধকারের কালো পর্দা ছেয়ে থাকে। আর রাতের মায়াবি আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে শহরের রূপ খুলে যায়। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, যুবতী, লাস্যময়ী হয়ে ওঠে, আলোর অসংখ্য দন্তপংক্তি জলসা-অনুষ্ঠানের জন্য খিলখিল হেসে ওঠে। তারপর রোজকার মত সকাল হয়। একে-একে সেই আলোগুলি নিভতে থাকে—চেহারা থেকে অপ্রতিভ হাসির মত ধীরে ধীরে মুছে যায়। সূর্য তার

আগ্নেয় হাত এগিয়ে দিয়ে, এক টানে সেই মায়াবী চাদর খামচে তুলে নেয়। রাতের নরম বাহুপাশ থেকে শহরকে টেনে হিঁচরে বাস্তবের ক্রুর উজ্জ্বলতায় এনে নগ্ন দাঁড় করিয়ে দেয়।...

'কিন্তু', অর্জুন ভাবে, 'ভোর হতে এখনও অনেক দেরী। সবে রাতের প্রথম প্রহর, এবং এই সময় বোম্বাইয়ের চেয়ে অন্য কোন সুন্দর শহর পৃথিবীতে নেই। শহরের কালো মখমলের ওপর যেন হীরে জহরৎ বিছানো রয়েছে। না, এসব নিছক কাব্য।' সে আবার ভাবে—'ঐ যে নীচে ছড়ানো আছে—কালো মখমল নয়—ওটা কালো সমুদ্র। ওগুলি হীরে-জহরৎও নয়—রাস্তা, বাড়ি, ঘর, দোকান, হোটেল, থিয়েটার, ক্লাব, নাচঘর, কারখানা, ফ্যাক্টরী, বস্তি আর কুঁড়ে ঘরের আলো। নিওন আলোয় লেখা মোটর গাড়ী, বিস্কুট, কাপড়ের মিল, সাবান এবং নাচ-গান ভরা চলচ্চিত্রের লাল-নীল-হলদে রঙের বিজ্ঞাপন।

দেশ-ভাগের পর গত পনেরো বছর ধরে সে এই শহরে। বোম্বাইয়েব রাতের সঙ্গে সুপরিচিত—পুরুষ যেমন তার স্ত্রীর শবীরের প্রতিটি রেখার সঙ্গে সুপরিচিত থাকে—তেমন! এই যে নীচে ঘূর্ণমান ছড়ানো আলোর জাল—প্রতিটি আলো তার পরিচিত। বছর কয়েক সে পত্রিকা দপ্তরে নাইট ডিউটি সেরে এই আলোয় মোড়া ফ্লোরা ফাউণ্টেন ধরে ভায়খালা ওব্দি, হেঁটেছে। তার প্রথম প্রেমের ব্যর্থতায় কযেকমাস কেবল মেরিন ড্রাইভেব পাথুরে ফুটপাথ মেপেছে, পথের ধারে স্থির দাঁড়ানো লাইট পোষ্ট গুণে কাটিয়েছে। ঊষার সঙ্গে যখন তার নতুন পরিচয় হলো, ভালবাসার সূচনা হলো, তাকে সঙ্গে নিয়ে কতবার চৌপাটিতে গেছে, চাট-ফুলুরির দোকানে গ্যাসবাতির হলদেটে আলোর তলায় বসে দুজনে দইবড়া, ফুচকা খেয়েছে—সব শেষে ঘোল খেয়ে বেনারসী পানেব দোকান থেকে সুগন্ধী পান কিনেছে। তারপব পান মুখে গুঁজে পায়ে হেঁটে হাসি-আলোচনা করতে করতে বালকেশ্বর, রোডের ল্যাইটপোষ্ট গুণতে গুণতে তারা দুজনে মালাবার হিলের মাথা ওব্দি গেছে। পথের ভিড়, হৈ-চৈ, কলরব—কোলাহল থেকে দূরে, হ্যাংগিং গার্ডেনের কাছে এ—টা বেঞ্চে বসে তারা দুজনে পরস্পরের বুকের স্পন্দন গুণেছে।

* * *

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই সুগন্ধী পানের স্বাদ কটু হয়ে গেছিল। কতদিন সে আর চৌপাটিতে কুরকুরে চাট-ফুলুরি খায়নি, ঠাণ্ডা-মিষ্টি ফালুদার স্বাদও সে ভুলে গেছে, এমন কি নির্জন-নিরিবিলিতে সে আর বুকের স্পন্দন শোনে না। এখন সে সারারাত ঊষার নাসিকাধ্বনি শোনে, আর ঘুমের মধ্যে ঊষা দুনিয়ার যাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে অর্জুনের বকবকানি শোনে। তারা দুজনে সারারাত তাদের তিনটি সন্তানের হাঁচি, কাশি এবং

কান্না শোনে।

'কি হয়েছে আমাদের?' অর্জুন মনে মনে আওড়ায়। আজও আমি ঊষাকে ভালবাসি। আমার বিশ্বাস, সেও আমাকে ভালবাসে। তাহলে আগের মত চৌপাটিতে গিয়ে আমরা চাট-ফুলুরি খাই না কেন? সুগন্ধী পান আর কেন সাজাতে দিই না? মালাবার হিলে গিয়ে রাতের নিরিবিলিতে পরস্পরের বুকের স্পন্দন শুনি না কেন?

জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর সে খুঁজে পায় না। কিন্তু তাকিয়ে দেখে, নীচে ছড়ানো শহর স্থির হয়ে আছে। তারপর এয়ারপোর্টের নীল, লাল, হলুদ আলো দ্রুতগতিতে উপরের দিকে ছুটে আসে। মুহূর্তে মনে হয়, এই বুঝি প্লেনটা আলোকমালার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। আর, সেই সব আলো বেলোয়ারী কাঁচের টুকরোর মত নক্ষত্র হয়ে অন্ধকার আকাশে ছড়িয়ে পড়বে।

এক ঝটকায় ব্রেক কষে, আর থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে প্লেন স্থির দাঁড়িয়ে পড়ে।

সিট থেকে নিজেকে আলাদা করে অর্জুন তার সহযাত্রির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে—'বোম্বাই এসে পড়েছে। এবার বেশ করে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু, কোন উত্তর আসে না। চেয়ে দেখে, বুড়োর চোখ দুটি খোলা, কিন্তু ঘাড়টি বিচিত্র অস্বাভাবিক ভাবে এক ধারে এলিয়ে আছে।

পাশেই সামনের সিট থেকে সরু গোঁফধারী একজন যুবক, কাঁধে এয়ার ব্যাগ তুলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর, কাছে এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে বুড়োর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়—এই যে, মিস্টার! 'কিন্তু বুড়োর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে, কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে পেছনে সরে যায়, বলে—ওল্ড ম্যান ইজ ড্রাঙ্ক। বুড়োটা মাতাল।'

মিনিট দুই পরে এয়ারপোর্টের ডাক্তার (যাকে এয়ার হোস্টেস ক্যাপ্টেন নামে ডাকছিল) সরাসরি পরীক্ষা করে বলে, বুড়ো হার্টফেল করে মারা গেছে।

অর্জুন বলে—আহা, বেচারার শেষ ইচ্ছা মনের ভেতরেই রয়ে গেল।

'কি বললেন আপনি?' পুলিশ ইন্সপেক্টর তাকে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বলে—আপনাকে আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টের থানায় যেতে হবে, নাম-ঠিকানা ডায়েরি করতে হবে। মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

'কিছুই না, কেবল এতটুকু জানি মৃত্যুর আগে তার বোম্বাই দেখাই প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল।'

'যাই হোক, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

'আচ্ছা চলুন।'

যাত্রীরা একে একে নেমে পড়ে—তারপর স্ট্রেচারে করে বুড়োর মৃতদেহ নাবানো হয়। পেছনে-পেছনে পোর্টফোলিও হাতে অর্জুন। তার পেছনে পুলিশ, ডাক্তার, প্লেনের দুজন পাইলট।

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে তখন হাজার হাজার বাতি নীল লাল হলুদ চোখে অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকে—বোম্বাইয়ে আগত অভ্যাগতদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়, তাদের ভ্রমণ-বিলাস-আনন্দে নিমন্ত্রণ জানায়। 'কিন্তু'—অন্ধকারে স্ট্রেচারটা মিশে যেতে দেখে অর্জুন ভাবে, 'বুড়োটা সারা জীবন বোম্বাই দেখার স্বপ্ন দেখেছে, অথচ আজ বোম্বাইয়ের রাতের বুকে চিরদিনের তরে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

'ট্যাক্সী!'

'ট্যাক্সী!'

দু-দিক থেকে একসঙ্গে ডাক আসে, অথচ এয়ারপোর্টে মাত্র একখানা ট্যাক্সী।

অর্জুনের প্লেন আটটায় ল্যান্ড করেছিল, কিন্তু পুলিশের জেরা শেষ হতে-হতে নটা বেজে যায়। ভেবেছিল, নাইট ডিউটিতে অফিস যাবার আগে মাতুঙ্গায় বাড়ী হয়ে যাবে, নইলে উষা ক্ষুন্ন হবে, প্রতিবারের মত রাগ করবে—তিন দিন পর দিল্লী থেকে ফিরলে, এয়ারপোর্ট থেকে নেবেই সোজা অফিসে। রিপোর্ট কাল লিখলে চলত না? তখন আবার তাকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে হবে—সংবাদপত্রের কাজে শুধু আজ হয়, 'কাল' বলে কিছু হয় না। আজকের খবরটাই হলো 'খবর', পরদিন সেটা বাসি হয়ে যায়, পচে যায়, আর জানই তো পচা মাছের কোন খদ্দের বাজারে পাওয়া যায় না। কিন্তু এয়ার-পোর্টেই এত দেরী হয়ে গেছে, দশটার মধ্যে যদিও বা সে অফিসে পৌঁছায়—একটা দেড়টা নাগাদ রিপোর্ট শেষ করে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। তার ওপর এমনই যোগাযোগ—এয়ারপোর্টে সবকটা ট্যাক্সী গায়েব, যাও বা একটা রয়েছে তাতে আবার অন্য একজন যাত্রী অধিকার নিতে ব্যস্ত।

'আপনি কোথায় যাবেন?' প্রশ্নকর্তা সেই সরু গোঁফধারী সুবেশ যুবক। প্লেনে তার সঙ্গে দিল্লী থেকে এসেছে। দুটো ভারি স্যুটকেশ ট্যাক্সীর পেছনে তুলে ফেলে।

'ফ্লোরা ফাউন্টেন ওব্দি যাবো, আপনি?

'আমি জুহুতে থাকি—ভেরি নিয়ার হোটেল জলতরঙ্গ। আমি সেখানেই নেমে পড়বো, তারপর আপনি ট্যাক্সী নিয়ে ফোর্ট ওব্দি যাবেন।'

অপরিচিত একজন লোকের সঙ্গে রাত্রে ট্যাক্সীতে যাওয়া সে ভাল মনে করে না, কিন্তু এ ছাড়া এখন আর কোন উপায় নেই। সরু গোঁফধারী

শ্যামবর্ণের যুবক হলুদ চামড়ার ছুঁচলোমুখো জুতো পড়ে আছে, তার আকাশি রঙের প্যান্টে এত কম ঘের—সেটাকে চুড়িদার পাজামা বলে ভুল হয়। পরনের চামড়ার সবুজ জ্যাকেটের নীচে গলায় পাঁচরঙা একখানা সিল্কের স্কার্ফ বাঁধা—কেন জানি, সেই যুবককে দেখে অর্জুনের মনে হয়, তারু মিহি সূক্ষ্ম গোঁফ থেকে শুরু করে সরু ছুঁচলো হলদে জুতো সব দিক থেকে তীব্র ভাবে খোঁচা মারার জন্য সরুসরু কোণ মুখিয়ে আছে। ট্যাক্সিতে তার পাশে দরজা ঘেঁসে বসে পড়ে সে। একটা ভয় তার মনে চেপে থাকে, পাছে সেই-ছুঁচলো সূক্ষ্ম গোঁফধারীর সর্বাঙ্গে বেরিয়ে আসা কোণ দিয়ে তাকে না আবার খোঁচা মেরে বসে!

ট্যাক্সি এয়ারপোর্ট কম্পাউন্ডের বাইরে বেরোতেই, অর্জুন তার সহযাত্রিকে জিজ্ঞেস করেঃ তুমিও তো দিল্লী থেকে আসছ, তাই না? তোমার এত দেরী হলো কেন? অন্যান্য যাত্রিরা ঘণ্টাখানেক হলো চলে গেছে।

'ওয়েল, য়ু সি,' সূক্ষ্ম গোঁফধারী যুবক বলতে শুরু করে থেমে পড়ে। তারপর, কিছুক্ষণ ভেবে সে বলে ওঠে— 'য়ু সি, লাগেজে আমার একটা স্যুটকেশ পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা খুঁজতেই এত দেরী হয়ে গেল।' তারপর সে সজোরে হেসে ওঠে—এও হতে পারে, আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলুম। অর্জুনের কাছে সে হাসি বড় কৃত্রিম ও শূন্য মনে হয়।

প্রত্যুত্তরে অর্জুন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই যুবকটি জিজ্ঞেস করে ওঠেঃ আচ্ছা, থানায় আপনাকে নিয়ে গিয়ে কি বলল? পুলিশেরা নিরীহ-ভদ্রলোকেদের অহেতুক ট্রাবল দেয়। বুড়োটার মার্ডারের চার্জ আপনাকে দেয় নি তো?

'না, এমন কিছু নয়। পুলিশের লোকেরা আমায় ভাল করে জানে।'

'রিয়েলি।' ওরা তোমাকে—আই মীন তোমাকেও ভাল করে জানে? ভেতরে গিয়েছিলে নাকি?

অর্জুন বুঝতে পারে, সরু গোঁফধারী যুবক তাকে চোর-ছ্যাঁচর মনে করেছে।

হেসে সে বলে—'না, না, সেসব কিছু নয়। আমি কাগজের রিপোর্টার—সেই সুবাদে পুলিশের লোকেদের সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ ঘটে থাকে। ফলে, আরও দেরী হলো।'

'মানে?'

জবাব দেয়ার আগে অর্জুন মুহূর্তখানিক ভাবে, তারপর মনে হয়, কোন ক্ষতি নেই, বলেই ফেলি। কাল সকালেই কাগজে খবর বেরিয়ে যাবে। 'ব্যাপার কি জানো, বুড়োর পকেটে ত্রিশ হাজার টাকা ছিল।'

'ত্রি-শ হাজার টাকা।' যুবকটি শিস্ দিতে-দিতে আওড়ায়, 'ত্রিশ হাজার

টাকা ত অনেক। হাজার টাকার নোট ছিল বুঝি ?'

'হ্যাঁ, হাজার টাকার নোট ছিল। প্লেনে বুড়ো যখন দেখিয়েছিল, কিন্তু ·· কিন্তু···কিন্তু, থানার ইন্সপেক্টারকে বলার পর সার্চ করে সে-টাকা আর পাওয়া গেল না। এক বাণ্ডিল টাকা—সব গায়েব।

'ওহ্!' যুবক উৎসাহে বলে ওঠে— 'ত্রিশ হাজার টাকা! ইশ্ যদি একসঙ্গে এতগুলো টাকা পেতাম, তাহলে···তাহলে···তাহলে···' তার মুখ থেকে কথা সরে না, কেবল 'তাহলে···তাহলে' আওড়াতে থাকে।

বাচ্চা ছেলেদের যেমন জিজ্ঞেস করে—'খোকা তোমাকে যদি একটা টাকা দেয়া হয়, তুমি তা দিয়ে কি করবে'—সেরকম ভাবে অর্জুনও জিজ্ঞেস করে,— 'যদি ত্রিশ হাজার টাকা পেতে, কি করতে তা দিয়ে ?'

বাচ্চা ছেলেরা যেমন জবাব দেয—চার আনার কোকাকোলা খাবো, চার আনার চকলেট কিনবো, আট আনার কমিক্সের বই কিনবো,—সেরকম ভাবেই যুবকটি জবাব দেয়, '···আমি···আমি···পাঁচ জোড়া স্যুট বানাবো, প্রত্যেকটি স্যুটের সঙ্গে রঙ ম্যাচ করে জুতো, সিল্কের দশজোড়া শার্টস্ আর একটা লম্বা রেসিংকার কিনবো। একদিন রাত্রে খাঁটি স্কচ হুইস্কি খাবো, প্রাণ উজার করে খাবো ; তারপর 'জলতরঙ্গে' ঢুকে ডিনার খাবো, লুসীর গান শুনবো—ওকে বলবো—'কাম অন লুসী, আমার নতুন গাড়ীতে তোমাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাব, সে হয়তো বলবে···'

সবে এতদূর এগিয়েছে, ট্যাক্সি এরিমধ্যে জুহুর সমুদ্রস্থিত হোটেল 'জল-তরঙ্গ'-এর কাছেই একটা কটেজের পাশে এসে দাঁড়ায়। ড্রাইভার নেবে স্যুটকেশ বার করতে করতে বলে—সাব, স্যুটকেশের ভেতরে কি পাথর ভরে রেখেছেন ?

'তা,—পাথরও ধরে নিতে পারো, ড্রাইভার! অবশ্য তোমার কোন চিন্তার কারণ নেই, এই নাও, ধরো।' বলেই সে ট্যাক্সিওলার হাতে দশটা টাকা গুঁজে দেয়।

'সাব, আমার কাছে ভাঙ্গানি নেই।' ড্রাইভারের মুখ থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা বুক ফুলিয়ে আমিরী মেজাজে বলে ওঠে—'কীপ্ দি চেঞ্জ।' তারপর অর্জুনের দিকে ফিরে বলে—থ্যাঙ্ক য়ু, মিস্টার···।

'অর্জুন—অর্জুন চোপরা—কিন্তু তোমার নামটা জানা হলো না মিস্টার··· ?'

'আমার নাম ?—আমার নাম—মিস্টার—মিস্টার জোসেফ। গুড নাইট।' বলেই সে ভারি স্যুটকেশ দুটো হাতে তুলতেই কটেজের ভেতর থেকে ষোল-সতরো বছরের, মাজা বর্ণ, রোগাটে ধরনের একটি মেয়ে আনন্দে খুশীতে চেঁচাতে-চেঁচাতে বেরিয়ে এল,—'ড্যাডি, মাইক এসেছে। ড্যাডি, মাইক

এসেছে।'

মেয়েটি মোটরের আলোর কাছে ছুটে এগিয়ে আসে। অর্জুন দেখতে পায়, তার ডাগর ডাগর চোখ জোড়ায় যোশেফ নামধারী ছেলেটার জন্য ভালবাসার রঙ ছড়িয়ে আছে।

'বোজী, এসব কি ছেলেমানুষী করছো, চলো ভেতরে।' ছেলেটা একটা স্যুটকেশ তোলে, অন্য স্যুটকেশটা মেয়েটি তোলে। স্যুটকেশ দুটি বেশ বড় সাইজের এবং ভারি, যে কারণে মেয়েটি নড়তে থাকে। তারা দুজনে দ্রুত পদক্ষেপে ভেতরে চলে যায়।

'গুড নাইট।' অর্জুন চেঁচিয়ে ওঠে। তারপর, ড্রাইভারকে আদেশ করে, 'চলো ভাই, একটু তাড়াতাড়ি করো, আমায় আবার অনেকটা দূর যেতে হবে।'

হোটেল জলতরঙ্গের পাশ ঘেঁষে ট্যাক্সি এগিয়ে যেতে ভেতর থেকে ড্যান্স-ব্যাণ্ডের সুরলহরী, সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম কোমল কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মাইক্রোফোনে টুইস্টের নতুন গান ঃ

ও হোঃ, মাই ডিয়ার—
কাম হিয়ার—
কাম নিয়ার—
মাই ডারলিং। -

ড্রাইভার বলে ওঠে—ছোকরা বড় দরাজ দিলের, সা'ব! পুরো সাত টাকা টিপস্ দিল। লোকটা কে?

'জানি না। তবে একটা ব্যাপার বোঝা গেল—যেই হোক না কেন, তার নাম যোশেফ নয়, মাইক।'

* * *

'হ্যালো মাইক!'
'হ্যালো আঙ্কল।'
'দিল্লী থেকে ফিরে এলে?'
'ইয়েস আঙ্কল!'
'সব মালপত্তর নিয়ে এসেছো?'
'ইয়েস আঙ্কল।'
'এম্বাসীতে সব ঠিক আছে ত?'
'একেবারে ফাস্ট ক্লাস, আঙ্কল।'
'পথে কোন ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা বাধে নি ত?'
'নো আঙ্কল! এভরিথিং নরম্যাল।'
'গুড! স্যুটকেশ খোলো।'

মাইক স্যুটকেশ খোলে। ওপরের দিকে ব্যবহৃত কাপড়চোপর, মোজা, জুতো আর তার তলায় হুইস্কির বোতল, ব্র্যাণ্ডির বোতল, জিনের বোতল—শ্যাম্পেনের বোতল।

আঙ্কেলের পরনে পুরনো একটা ড্রেসিং গাউন। তাঁর কাঁচা-পাকা গোঁফ সিগারের ধোঁয়ায় হলদেটে হয়ে গেছে। সে একটা উগ্র গন্ধের সিগার টানছে। তার গভীর তামাটে চেহারায় বিচিত্র বলিরেখায় এক অদ্ভুত বিষণ্নতা ছেয়ে রয়েছে। কিন্তু বাক্সের সবকটা বোতল দেখার সঙ্গে সঙ্গে বোতামের মত ছোট হয়ে আসা চোখজোড়া আগুনের ফুলকির মত জ্বলে ওঠে। রেখাবহুল মুখের চামড়া এক বিচিত্র আনন্দ-উল্লাসে ভরে ওঠে।

'গুড বয়! ওয়েল ডান! এই নাও।'

'মাত্র ত্রিশ টাকা।' মাইক নোট কটা হাতে নিয়ে এমন ঘৃণাব দৃষ্টিতে দেখে, যেন ত্রিশ টাকা নয়, ত্রিশ নয়া পয়সা।

'তবে, কত দিতে হবে—ত্রিশ হাজার?'

'যাদের দেবার ইচ্ছে থাকে, তারা ত্রিশ হাজারও দেয় আঙ্কল, বলেই সে সরে যায়। তারপর, শিস দিতে দিতে গলা থেকে মাফলার খুলে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রাখে।

বটে! মাইকের দিকে তাকিয়ে আঙ্কল হুঙ্কার ছাড়ে। তারপর চিৎকার করে ডেকে ওঠে—রোজী।

'ইয়েস ড্যাডি!' সেই ক্ষীণ শরীর, শ্যামবর্ণ মেয়েটি, অপুষ্ট বুক নিয়ে ছুটে আসে। নাম তার রোজী বটে, কিন্তু গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠার আগেই শুকিয়ে গেছে। তোমার জন্য চা করি, মাইক? সে ঐ সুক্ষ্ম গোঁফধারী যুবকটিকে জিজ্ঞেস করে। মাইক ওয়াশ-বেশিনে হাত মুখ ধুতে ব্যস্ত।

'নো, থ্যাঙ্ক য়ু রোজী। এখন চায়ের সময় নয়।' উদাসীন গলায় জবাব দেয়। রোজীর দিকে ফিরেও তাকায় না।

'রোজী, চায়ের জল হয়ে গেছে?'

'ইয়েস ড্যাডি।'

'ছাঁকনিতে ছাঁকা হয়েছে? কোন পাতা রয়ে যায় নি তো?'

'নো ড্যাডি।'

'গুড গার্ল। এবার এই বোতলগুলি তুলে আমার ঘরে রেখে এসো। আর শোনো, ইনজেকশানের সিরিঞ্জ বার করে রাখো।'

'ইয়েস ড্যাডি।' রোজীর ডাগর কালো চোখজোড়া বার বার মাইকের দিকে ঘুরে দেখছিল। তোয়ালে দিয়ে মাইক এখন মুখ মুছছে।

রোজী বোতলগুলি তুলে পাশের ঘরে নিয়ে যায়। আঙ্কল বলে—মাইক, আজ ছ'টা বোতল কারমাইকেল রোডে পৌঁছে দিতে হবে। ট্যাক্সী করে যেও।

ভাড়া বাবদ তোমায় পনরোটা টাকা দেয়া হবে।

'পনরো টাকা?' মাইক ভ্রূ কুঁচকে কথাটা আওড়ায়।

'পনরো টাকা কম নাকি, য়ু ফুল?' আঙ্কল রাগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এখান থেকে কারমাইকেল রোডে যাবার জন্য কম হলো? তোর বাপ সারা দিনে মাছ ধরে তবে গিয়ে চার পাঁচ টাকা আয় করে। ভুলে গেছিস, কোন গ্যারেজে তুই মেকানিক ছিলিস? ক'টাকা মাইনে পেতিস সেখানে? মাস গেলে এক'শ কুড়ি টাকা! আর আমি তোকে তিনদিন অন্তর প্লেনে দিল্লী পাঠাই, প্রত্যেকবার ত্রিশ-চল্লিশ টাকা করে হাত-খরচ দিই। তাছাড়া, আলাদা ভাবে পনরো-কুড়ি টাকা ইনকাম করার চান্স দিই। আর তুই কিনা 'নো' বলিস······'

কিন্তু, মাইকের মনে এই বক্তৃতার কোন বিশেষ প্রভাব পড়ে না, আঙ্কেলের চোখে চোখ রেখে সে শুধু বলে, 'সরি আঙ্কল, আমি যেতে পারবো না। আই হ্যাভ এ ডেট—উইথ লুসী—লুসীর সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।

'লুসী! মাই ডিয়ার বয়, ঐ গোল্ড ডিগার—অর্থপিশাচী মেয়েটার পেছনে কেন সময় নষ্ট করছো? ওর পেছনে কত প্রিন্স আর লক্ষপতি বিজনেসম্যানরা ঘুরে বেড়ায়। তোর দিকে সে ফিরে তাকিয়েও দেখবে না।'

'দেখা যাবে, আঙ্কল, দেখা যাবে।' বলে সে জামাপ্যান্ট খুলে সেখানেই কাপড় পাল্টাতে লাগে। আঙ্কল চাপা রাগে রুদ্ধ আক্রোশে হুঙ্কার দিতে দিতে পাশের ঘরে চলে যায়।

শিস দিতে দিতে মাইক টাইয়ের গিঁট বাঁধে। রোজী ফিরে আসে। এবার সে আধ-ময়লা ফ্রকের পরিবর্তে কাচা গোলাপি ফুল আঁকা ছিটের ফ্রক পরে। সোজা টান-টান করে আঁচড়ানো চুলে একটা গোলাপি রিবন বাঁধা।

'মাইক।'

'ইয়েস।'

'লুক অ্যাট মী। আমার দিকে চেয়ে দেখ না, কেমন দেখাচ্ছে।

মাইক কোট গায়ে দিতে দিতে ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর বলে—'বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছ তুমি? হ্যাভ য়ু গট এ ডেট?'

'ইয়েস মাইক! তোমার সঙ্গে।'

'কিন্তু, আমি যে জলতরঙ্গ হোটেলে যাচ্ছি।'

'আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না, মাইক। আমি তোমার সঙ্গে ডান্স করবো! মাইক, প্লীজ!' তার গলার স্বরে অনুরোধ ও ডাগর কালো চোখে নিরাশার অশ্রুবিন্দু।

'রোজী আই অ্যাম সরি, আমাকে ক্ষমা করো, লুসীর সঙ্গে আমার দেখা

করতে হবে।'

বলেই সে বাইরে বেরিয়ে যায়।

রোজী তাকে বাধা দিতে দরজা অব্দি ছুটে এগিয়ে যায়, কিন্তু তার আগেই মাইক বেরিয়ে পড়ে। বাইরে কেবল নিস্তব্ধতা, অন্ধকার এবং সমুদ্রের ঢেউয়ে ব্যথাক্ত আক্ষেপ, যা নির্মম বালুকা-বেলায় কেবলই মাথা ঠুকতে থাকে।

* * *

কারমাইকেল রোডে নব-নির্মিত গুলিস্তান বিল্ডিং এর সাত তলায় জম্বু প্যাটেলের সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। যার ফলে বন্ধ দরজা-পথে সমুদ্রের ঢেউয়ের কোন শব্দ ভেতরে শোনা যায় না। কিন্তু জানালার বড় বড় কাঁচ বেয়ে শহরের চারদিকে সুসজ্জিত আলো দেখা যায়।

'লুক, মাই ডিয়ার।' গ্লোরী অ্যাডভার্টাইজার্সের টোটেলাল এই অজু-হাতে মুনীর ভাইয়ের স্ত্রীর স্লিভলেস ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা সুঠাম বাহুতে চাপ দিয়ে বলে—'এই জানালা দিয়ে কত সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। বাঁ দিকে মহালক্ষ্মী মন্দির—চুঁড়োর ফলকে লাইট আঁটা আছে। কিছুটা এগিয়ে গেলে সমুদ্রে ঘেরা হাজী আলীর কবর।'

"ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশান" পেছন থেকে স্বর ভেসে আসে। চমকে সে পেছন ফিরে দেখে, টেকো মাথা চাচা চুনীলাল হুইস্কির গেলাস হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। এককালে চাচা চুনীলাল বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু এখন সে স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের দালালি করে। তবুও, আজও সে প্রতিটি পার্টিতে চার পেগ হুইস্কি খেয়ে বিশুদ্ধ প্রগতিশীল ভাবধারায় আলোচনা করে থাকে।

জাতীয় সংহতির এর চেয়ে উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এক দিকে মন্দির, অন্যদিকে মসজিদ, কবর। আরও কিছুটা এগোলে মহালক্ষ্মী মন্দির অর্থাৎ মহালক্ষ্মী রেসকোর্স। পেছনে যে সব আলো চোখে পড়ছে—সব কটাই কাপড়ের মিল। এখন, এই রাতেও মিলগুলি চলছে, এত সূক্ষ্ম ও দামী কাপড় তৈরী হয় যে সেসব কাপড় ঐসব মিল-শ্রমিকরাও কিনতে পাবে না। মিলের পেছনে প্যাটেলের বস্তি—এই ফ্ল্যাটের বাথরুমের চেয়েও ছোট-ছোট কুঁড়েঘরে ঐসব শ্রমিকদের বৌ-রা, নাইট ডিউটি ফেরৎ স্বামীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে। রেসকোর্সের ওপারে নোংরা নালার ধারে যে সব কুঁড়েঘর আছে, এই বিংশ শতাব্দীতে সহজেই আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়—মানুষ যখন ইট-পাথর, সিমেন্ট ও লোহার ঘর-বাড়ী তৈরী করতে শেখেনি। কিন্তু যা দেখছেন—সব এই এয়ার কণ্ডিশনড ফ্ল্যাটের বাইরে। এখানে বন্ধ শার্সী বেয়ে মসজিদের কোন আজান শোনা যায়না, মন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি, কিংবা মিলের ঘর্ঘর শব্দও

শোনা যায় না। ফুলের গন্ধে মঁ মঁ করা এসব ফ্ল্যাটে নোংরা নর্দমার দুর্গন্ধও আসতে পারে না। হ্যাঁ, আমরা একেবারে সুরক্ষিত—মাই ডিয়ার আমরা একেবারে সুরক্ষিত। সংসারের যাবতীয় নোংরা ও দুর্গন্ধ থেকে আমরা সুরক্ষিত।…এসো, সিক্যুরিটির নামে আমরা এই মদ্য পান করি। তাড়াতাড়ি শেষ করি, নইলে এই যে কাঁচের পাঁচিল—আমাদের একমাত্র অবলম্বন,—কে জানে কখন কোন মুহূর্তে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক পাথরের আঘাতে পাঁচিল চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলবে। হিয়ার ইজ টু ইওর…আরে, তোমরা গেলে কোথায় ?

চাচা চুনীলাল দেখে, সুযোগ পেয়ে টোটে আর মুনীর-ভাইয়ের স্ত্রী দুজনেই সেখান থেকে সরে পড়েছে। আর সে একা একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে—'বেশ, তাহলে আমি একাই তোমাদের নামে মদ খাই।' বলেই পঞ্চম পেগ গলায় উপুড় করে দেয়।

* * * *

'স্যার।' একটা মিষ্টি সুরেলা স্বর ভেসে আসে।

পাঁচ পেগ হুইস্কির গোলাপি নেশায় চাচা চুনীলাল দেখে, একটি বিদেশী যুবতী তার দিকে এগিয়ে আসছে।

'আমি কি আমার পরিচয় দিতে পারি ? আমার নাম ক্যারল্ স্মিথ। মিসেস ক্যারল স্মিথ। গতকাল আমেরিকা থেকে এসেছি। মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঘটে নিউইয়র্কে—সেখানে তিনি হোটেলের জন্য জিনিষ-পত্তর কিনতে গিয়েছিলেন। আজ তার হাউস ওপেনিং পার্টিতে আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস্ প্যাটেল গৃহপ্রবেশের ব্যাপারে এত ব্যস্ত, তাছাড়া এত ভিড় যে এখনও কারো সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি।

চাচা চুনীলাল চোখেমুখে গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলে—'মাই ডিয়ার মিসেস্ স্মিথ, এ কাজ আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করছি। প্রথমে আমার নিজের পরিচয় দিচ্ছি। আমি হলাম চুনীলাল। সবাই আমাকে চাচা চুনীলাল বলে।'

'আপনি বুঝি চা-চা ডান্স খুব ভালো জানেন ?'

'নো, মাইডিয়ার। সে চা-চা নয়। ভারতে চাচা 'আঙ্কল'-কে বলা হয়। তুমিও আমাকে 'আঙ্কল' বলে ডাকতে পার।

থ্যাঙ্ক য়ু আঙ্কল। আচ্ছা, এই যে এখানে সকলে এসেছেন—তারা কে কে ?

'ওকে মাই ডিয়ার। তোমার হোস্টকে তুমি জানই। তার প্রকৃত নাম যশবন্ত, কিন্তু অত্যধিক মেদবৃদ্ধির দরুণ তার বন্ধুরা তাকে 'জম্বু' নামে ডাকে। এই ফ্ল্যাটটি এবারে দেড় লাখ টাকায় কিনেছে—অবশ্য তা থেকে

পঞ্চাশ হাজার ব্ল্যাকে দিতে হয়েছে। সেই আনন্দেই আজ এই পার্টি'র আয়োজন। জম্বু এবং তার স্ত্রী শম্মী প্যাটেলকে তুমি জানই। ঐ যে লম্বাটে দোহারা গড়নের ফর্সা লোকটা তার সঙ্গে কথা কইছে সে হলো—লালমুল লালওয়ানি, বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টর এই বিল্ডিং তৈরী করেছে। তার পকেটে ব্ল্যাকের ঐ পঞ্চাশটি হাজার টাকাও গেছে। সেইজন্য তার চেহারায় আজ চটক ছড়িয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে বেঁটে ধরনের শ্যামবর্ণ যে মেয়েটি আস্তে আস্তে শ্যাম্পেনে চুমুক দিচ্ছে, সে হলো ফিফি ফটকরিয়া, মেয়েদের মাসিক পত্রিকা 'মহারাণী'র সহ-সম্পাদক ; শোনা যাচ্ছে, লালওয়ানি তার জন্যও একটা ফ্ল্যাট তৈরী করেছে, খরচ-পত্রের হিসেব অবশ্য তাদের দুজনের হৃদয়ে সীমাবদ্ধ। ঠিক তার পেছনে 'বারে' হেলান দিয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাঝে কৃষ্ণকেশ সমৃদ্ধ সুন্দরী রমণী হলো শ্যামপুরের ছোট মহারানী শীলা দেবী। শুধু সুন্দরী নয়, বরং পঁয়তাল্লিশ বছরের বিধবা রমণী—গত বছরে তার মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি তিন বছর অন্তর তোমাদের দেশে যায়, সেখানে 'ফেস লিফটিং' করার সময়ে ডাক্তাররা কি জাদু করে—যার ফলে পূর্বাপেক্ষা তন্বী ও সুন্দরী হয়ে ফিরে আসে। তার সঙ্গে বাদামী রঙের যে যুবক দাঁড়িয়ে কথা বলছে—সে একজন উৎসাহী ইংরেজী ফিল্ম ডিরেক্টর—মহারানীর অন্তরঙ্গ প্রেমিক, প্রতি মাসে তাকে বিয়ের প্রপোজাল দেয়। ঠিক তার মুখোমুখি মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল নিয়ে যে যুবক দাঁড়িয়ে আছে—সে কিন্তু যুবক নয়, পঞ্চান্ন বছরের চিত্র অভিনেতা সুন্দর কুমার, আমার মত যার মাথা জুড়ে বিরাট টাক। মাথায় কোঁকড়ানো চুল আসল নয়—'উইগ'। প্রতিদিন হেয়ার ড্রেসার পাঁচটা ক্লিপ এঁটে 'কার্ল' তৈরী করে দেয়। তার সামনে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছে ··

*　　　*　　　*

চুনীলালের পরিচয়পর্ব এতদূর এগিয়েছে, এরি মধ্যে বারের দিক থেকে শব্দ ভেসে আসে, 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টলমেন, হুইস্কি শেষ। এবার আপনারা রেফ্রিজিটরের ঠাণ্ডা জল খেতে পারেন।'

"শেম শেম।" চারদিক থেকে ধিক্কৃত স্বর ভেসে আসে। জম্বু প্যাটেল দৌড়ে 'বারের' দিকে এগিয়ে যায়। লজ্জায়, রাগে, অপমানে এবং ছ পেগ হুইস্কির নেশায় তার চেহারা লাল হয়ে ওঠে। 'টোটে, কি সব যা-তা কথা বলছো তুমি ? আমি নিজে ডজন খানিক বোতলের ব্যবস্থা করেছিলাম।'

'মাই ডিয়ার জম্বু, বারোটা হুইস্কির বোতল এখানে ছিল বটে। এছাড়াও জিনের দুটো বোতল, একটা ব্রাণ্ডির এবং তিনটে শ্যাম্পেনেরও বোতল ছিল—কিন্তু সব যে খালাস হয়ে গেছে। বেশী সংখ্যক অতিথি নিমন্ত্রণ করেছো, ফলে মদে ঘাটতি পড়েছে। ঠিক আছে, তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই।

আমি আমার বুটলেগারকে ফোন করে দিচ্ছি।...তার কাছে আমার 'ক্রেডিট খাতা' চলে।

"টোটো, তুমি আমায় ইনসাল্ট করতে চাইছো। বেশ, তবে জেনে রাখ, এ কখনও হতে পাবে না। দুটো স্কচের একস্ট্রা বোতলের জন্য আগে থেকেই বলে রেখেছিলাম—আজই দিল্লী থেকে ইভিনিং ফ্লাইটে স্টক আসার কথা।

সুন্দর কুমার তার উইগে ফিল্মস্টার ধরনের চুল উঁড়িয়ে বলে—'জম্বু, ডার্লিং, তোমার দিল্লীর প্লেন আজ লেট আছে সম্ভবতঃ।'

সকলে সশব্দে হেসে ওঠে।

কিন্তু টিনু টিকমদাস বলে ওঠে—'প্লেনের দোষ দিচ্ছ কেন, ব্রাদার। আজকের ইভিনিং ফ্লাইটে আমিও দিল্লী থেকে ফিরছি। আর বলো না, একটা বুড়ো, প্লেনেই হার্টফেল করে মারা গেল। সেই বুড়োটা জম্বুর বুটলেগার ছিল না তো?'

এবার সকলের মুখে হাসির ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

চাচা চুনীলাল দোহার গেয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে,—জম্বু ডিয়ার। হুইস্কি উইদাউট সোডা, নো নো, সোডা উইদাউট হুইস্কি-ই খাইয়ে দাও। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।...

এ কথা শুনে আরও তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ে সবাই। চারিদিক থেকে জম্বুকে যেন খোঁচা মারতে থাকে, 'হা-হা-মদ্যপান নিষেধের কথা এতদিন ধরে শুনেছি, আজ কিন্তু প্রত্যক্ষ করা গেল।'

'গবর্নমেণ্টের উচিৎ জম্বুকে প্রোহিবিশন পুলিশের ইনচার্জ করে দেয়া।'

'আগে চাল-গমের রেশনিং ছিল, পরে দুধের হলো। এবার জম্বু হুইস্কির রেশনিং করল।'

রাজা, অপমানে, উত্তেজনায় জম্বু কাঁপতে থাকে। কিন্তু, কোন জবাব সে দিতে পারে না। তার স্ত্রী বলে, 'ডার্লিং, তোমার বুটলেগরকে ফোন করে দেখ না। এত দেরী করছে কেন?'

দৌড়ে জম্বু ফোনের কাছে এগিয়ে যায়। কাঁপতে কাঁপতে অস্থির-চঞ্চল আঙুলে ফোনের ডায়াল ঘোরায়, 'হ্যালো, আঙ্কল ডি-সুজা, ইয়েস আমি জম্বু বলছি। সেই ছ বোতল হুইস্কির কি হলো? তোমার জন্য আজ আমার সাংঘাতিক ইনসাল্ট হয়েছে...তোমার ভাইপো চলে গেছে, আমি কি করব?... তোমার নিজের আসা উচিৎ, অথবা কাউকে সঙ্গে নিয়ে পাঠিয়ে দিতে।... কি বললে?...'বোতল পাঠিয়ে দিয়েছ।...এতক্ষণে পেঁৗছে যাবে।...ওক্কে... থ্যাঙ্ক গড।' ফোন নাবিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় কলিং বেলের ঘণ্টি বেজে ওঠে।

ভৃত্যের চেয়েও দ্রুত বেগে জম্বু নিজেই দৌড়ে এগিয়ে যায়। দরজা.

খুলতেই দেখতে পায়, দুর্বল-শীর্ণ, মাজা-মাজা রঙ, অনুন্নত বুক নিয়ে একটি মেয়ে গোলাপি ফুল আঁকা ফ্রক পরনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা ক্যানভাসের থলে।

'স্যার, মিস্টার প্যাটেলের ফ্ল্যাট এটাই তো? আমায় আঙ্কল সুজা··· আই মিন ড্যাডি আমাকে···

এতটুকু সবে বলেছে, অমনি জম্বু তাকে থলে শুদ্ধ হিড়হিড় করে টেনে আনে, টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়।

'লেডীজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। হুইস্কী এসে পৌঁছেছে, আঙ্কল সুজা নিজে তার মেয়ের হাতে পাঠিয়েছে! থ্রি চিয়ার্স ফর মিস···মিস···'

'রোজী।'

'থ্রি চিয়ার্স ফর মিস্ রোজী ডি সুজা।'

'হিপ্—হিপ্—'

'হুররে।'

চাচা চুনীলাল তার নেশাগ্রস্ত চোখে রোজীকে আপাদমস্তক দেখে, তারপর সৌজন্যতা ছাড়িয়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'রোজী, য়ু আর এ লাইক-সেভার! তুমি আমার প্রাণ আর জম্বুর প্রেস্টিজ রক্ষা করেছ।' এই বলে তাকে চেপে ধরে আদর করে।

টিটো সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, যেন কোনো বাচ্চা ছেলের হাতে নতুন খেলনা হাজির হয়েছে, 'চাচা চুনীলাল, দ্যাট ইজ্ এ গুড আইডিয়া।'

"স্যার···স্যার" রোজী বারণ করতে থাকে, কিন্তু কেউ তার কথা শোনে না।

ওদিকে হুইস্কীর বোতল খোলে, গেলাস ভরে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সোডার ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

অন্যদিকে সকলেই রোজীকে জড়িয়ে বারবার নির্লজ্জভাবে চুমু খেতে থাকে।

যারা রোজ ঘোড়দৌড়, রামি, ফ্লাশ খেলে, রোজকার সাধারণ ফ্লার্টশনে মন একঘেয়ে হয়ে গেছিল, তাদের কাছে এ এক অভিনব খেলা মনে হয়।

কে একজন বলে ওঠে, রোজী, ডার্লিংকে হুইস্কী দাও।

প্রথম গেলাস তাকে জোর করে খাইয়ে দেয় কেউ। রোজীর মনে হয়, কেউ যেন ছুরি দিয়ে তার গলা চিড়ে ফেলল। কিন্তু, পরমুহূর্তে তার সমগ্র শরীরে উষ্ণতার এক বিচিত্র স্রোত বয়ে বেড়াতে থাকে।

দ্বিতীয় গেলাস কারো জোর জবরদস্তি ছাড়াই খেয়ে ফেলে।

তৃতীয় গেলাস সে চেয়ে খায়।

তারপর গুণতে ভুলে যায়।

রেডিয়োগ্রামে কেউ রেকর্ড বসিয়ে দেয়। সকলেই নাচতে শুরু করে।

রোজীকেও বার বার সকলের সঙ্গে নাচতে হয়। তার মাথা ঘুরতে থাকে, গোটা দুনিয়া তার চোখের সামনে ঘুরতে থাকে।

হলের সবকটা বাতি গানের তালে তালে নাচতে থাকে।

হুইস্কীর সবকটা বোতল নাচতে থাকে।

রোজীর শরীরে সমস্ত শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্ত নাচতে থাকে, গাইতে থাকে।

তারপর কখন, কেমন করে সে ডান্স ফ্লোর থেকে বেডরুমে আসে—জানে না। মাথার ওপর ইলেকট্রিক বাল্ব ঘুরছিল, নাচছিল। ঘুরতে ঘুরতে সেগুলি সহসা নিভে যায়। অন্ধকার···চারদিকে শুধু অন্ধকার আর রাত্রি। রোজীর নরম শরীর চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া তীক্ষ্ম লোহার খাঁচায় চেপে কষে ধরে। বেহুঁশের মাঝে রোজী বিড়বিড় করে আওড়ায়, 'স্যার-স্যার—হুইস্কীর উষ্ণ শ্বাসের একজোড়া শক্ত ওষ্ঠ তার কাছে এগিয়ে আসে—আরও কাছে—ঘন, ভারি, তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসতে থাকে, এবং সে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যন্ত্রণার অন্ধকার সমুদ্রে ডুবে যায়। কেবল চেতনার গহ্বর থেকে একটা শব্দ বের হয়, 'মাইক।'

এয়ার কণ্ডীশণ্ড ফ্ল্যাটের বাইরে সমুদ্র তখন রাতের নির্মম বেলায় মাথা ঠুকতে থাকে।

*   *   *

হোটেল জলতরঙ্গের ডান্সের বাদ্যের তালে তালে সমুদ্রের ঢেউও নাচতে থাকে।

ওপেন এয়ার ডান্স ফ্লোরে জোড়া জোড়া সবাই নাচে। চারিদিকে লোকেরা টেবিলে বসে টি-পট থেকে হুইস্কী ঢেলে চায়ের পেয়ালায় খায়।

বাইরে নারকেল গাছের তলায় তাদের বিরাট দামী লম্বা-চওড়া মোটর দাঁড় করানো আছে।

'এটা কার গাড়ী?' একটা বেঁটে ধরনের লম্বা টু-সীটার রেসিংকারের দিকে ইশারা করে মাইক জানতে চায়।

দারোয়ান বলে, 'চন্দনপুরের নবাব সাহেবের মোটরকার।'

মিনিট দুই পরে চন্দনপুরের নবাবের কাছে মাইক আত্মপরিচয় দেয়, 'আই অ্যাম মাইক ডি-সুজা, ইওর হাইনেস।'

'বসুন, মিঃ ডি'-সুজা! বলুন, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

'আপনি কি আমায় গাড়ীটা বিক্রী করতে পারেন?'

'পাগল হয়েছেন নাকি? আমি গাড়ী বিক্রী করতে যাব কেন?'

'বড় দুঃখিত।' তারপর মাইক চেঁচিয়ে ওঠে, 'বয়।' বেয়ারা দৌড়ে

ছুটে এসে হাজির হয়, 'নবাব সাহেবের বিল নিয়ে এস, তাড়াতাড়ি।'

'দেখুন, মিস্টার। আপনি কে জানতে পারি?' আমার বিল পেমেণ্ট করার অনুমতি আপনাকে কে দিয়েছে?

এরিমধ্যে বেয়ারা বিল এনে হাজির করে 'ষাট টাকা হয়েছে, সা'ব।

'এই নাও।' নবাব সাহেব বাধা দেয়ার আগেই সে ব্যাগ খুলে হাজার টাকার একখানি নোট বার করে ট্রের ওপর ছুঁড়ে ফেলে।

'স্যার। এ যে হাজার টাকার নোট।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'চেঞ্জ পাওয়া এ সময়ে অসুবিধে হবে স্যার।' কোন ছোট নোট নেই?

'দেখছি।' বলেই মাইক পরম তাচ্ছিল্যে ব্যাগ খোলে, তা থেকে হাজার টাকার নোটের তাড়া বার করে টেবিলের ওপর রাখে।

'সরি, কোন ছোট নেই। থাকগে, কোন ব্যাপার নেই। কাল আমি চেঞ্জ নিয়ে যাবো। নোটটা তোমার কাছে থাকুক।···আচ্ছা নবাব সাহেব, এবার তাহলে আজ্ঞা করুন?'

'বসুন, মিস্টার ডি সুজা।' এবার নবাব সাহেবের কণ্ঠস্বর, ধরণ-ধারন পালটে গেছিল। 'তুমি মোটরকার কিনতে চাইছো কেন, তাও আবার এখানে, এই সময়ে?'

'ভালবাসার ব্যাপার!—সম্ভবত আপনি তা বুঝতে পারবেন না। কিন্তু মোটর যে আমার দরকার, এখনই—এ সময়ে। বলুন, কত নেবেন?

'বিশ হাজারে আমি কিনেছিলুম।'

'তাহলে এই নিন বিশ হাজার।'

সঙ্গে সঙ্গে কুড়িখানা নোট গুণে সামনে রেখে দেয়। নবাব সাহেব মোটর গাড়ীটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে চৌদ্দ হাজারে কিনেছিল। হাল্কা হেসে টাকাগুলো তুলে নেয়।

'রসিদ লিখে দিন, মোটরের পুরো দাম পেয়েছি।'

নবাব সাহেব রসিদের ওপর সই করে দেয়।

গুড নাইট, ইওর হাইনেস। থ্যাঙ্ক য়ু।

'থ্যাঙ্কু য়ু, মিঃ ডি'সুজা।' নবাব সাহেব নোটের তাড়া পকেটে রাখতে রাখতে জবাব দেয়—গুড নাইট।

*　　*　　*　　*

সেই মুহূর্তে ব্যাণ্ডের সঙ্গীতলহরী বদলে যায়, ডান্স ফ্লোর শূন্য হয়ে পড়ে। আলোর একটা জোরালো বৃত্ত লুসীর ওপর এসে পড়ে। মাইক্রোফোনের সামনে লুসী দাঁড়িয়ে। সমগ্র হোটেল হাততালির শব্দে ভরে ওঠে।

অ্যানাউন্সার উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হোটেল বন্ধ হবার আগে মিস্ লুসী

তার শেষ গান পরিবেশন করবেন।'

চারিদিক থেকে স্বর ভেসে আসে, 'ও মাই ডিয়ার। ও মাই ডিয়ার।'

স্মিত হেসে লুসী তার ঢঙমাখানো সুরেলা কণ্ঠস্বরে গান শুরু করে। শুধু কণ্ঠস্বর নয়, তার আঁটোসাটো শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও যেন সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে ওঠে। হাতের ইশারায়, চোখের পলকে, বুকের উন্নত ঢেউয়ে, নিতম্বের বিচিত্র গভীর তরঙ্গে—সর্বাঙ্গে।

ও মাই ডিয়ার
ওহ্ মাই ডিয়ার।
কাম হিয়ার
কাম নিয়ার।
ও মাই ডার্লিং······

এ শুধু গান নয়, যেন এক ইশারা, এক আমন্ত্রণ, এক ঘোষণা। আর যে ধরনের ভঙ্গিতে গাইছে, তাতে শ্রোতা ও দর্শকদের মনে হতে থাকে—এ গান কেবল তার জন্য—কেবল তার জন্যই সে গাইছে।

গান শেষে লুসী যখন ড্রেসিংরুমে ঢোকে, সেখানে আধ ডজন ফুলের বুকে সেই সঙ্গে কার্ড রাখা রয়েছে।

কৃত্রিম অনুৎসুকতায় সে কার্ডগুলি তুলে পড়তে শুরু করে।

'নবাব সাহেব, চলনপুর।'

'মিস্টার মুলচন্দ জোহুরী।'

'ঠাকুর সম্পূর্ণ সিং।'

'মিস্টার বোমনজী কুকওয়ালা।'

'মিস্টার পিটার স্যামসন।'

'মিস্টার মাইকেল ডি'সুজা।'

শেষ কার্ডটা পড়তেই সে রাগে ফেটে পড়ে। তার খাস পরিচারিকাকে বলে—লোফারটা আবার এসেছে? কে আসতে অনুমতি দিয়েছে ওকে?

'লুসী ডার্লিং।' বলতে বলতে মাইক ঘরে ঢুকে পড়ে। তার হাতে হুইস্কীর দুটো বোতল, তোমার ছাড়া আর কারই বা অনুমতির দরকার ডার্লিং। আমি তোমায় বাড়ি ওব্দি পেঁাছে দেয়ার জন্য এসেছি। জুহু থেকে বাইকুল্লা একা-একা তুমি যাবে কি করে?

'আমি ট্যাক্সিতে যাবো না। আজ আমি চলনপুরের নবাব সাহেবের সঙ্গে যাবো।'

'তাহলে তোমায় আজ নিশ্চিত ট্যাক্সিতেই যেতে হবে।'

'মানে? জানো, নবাব সাহেবের খুব সুন্দর একটা মোটরকার আছে।'

'মানে—সেই মোটরকারটা এখন আর নবাব সাহেবের নেই—আয়া, তুমি

এখন যাও, সকলকে গিয়ে বলে দাও—লুসী মেমসাব ডি সুজা সাহেবের সঙ্গে যাবে। সকলেই যেন সোজা বাড়ি ফিরে যায়। আর এই ধরো হুইস্কী, সোডা নিয়ে এসো—সঙ্গে চারটে বোতল।

আয়ার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'স্যার-স্যার এ যে হাজার টাকার নোট!'

কি হয়েছে তাতে? আপাততঃ এখন এটাই ধরো। আমার কাছে কোন ছোট নোট নেই।

'মাইক ডার্লিং'—লুসী বড় মিষ্টি স্বরে ডাকে—এসব তুমি কি করছ। আমার যে মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। তারপর এগিয়ে মাইকের গলা জড়িয়ে আদর করে গুনগুন করে ঃ

'ও মাই ডিয়ার।
কাম নিয়ার!
কাম নিয়ার।
কাম নিয়ার······'

* * *

প্রায় রাত দুটো নাগাদ অর্জুন তার রিপোর্ট নিউজ-এডিটরের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—শহরের খবর কি?

লোকাল নিউজের ওপর চোখ বুলিয়ে নিউজ এডিটার জবাব দেয়—তেমন বিশেষ কোন খবর নেই। সত্যি বলতে কি, বোম্বাইয়ে আজকাল তেমন কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেনা। একটা বৃদ্ধের মৃত্যুসংবাদ—প্লেনে বসেই হার্টফেল করেছে। রিপোর্টটা তো তুমিই লিখেছো। সিবড়ীব বস্তিতে একজন সন্দেহবাতিক স্বামী তার বউয়ের নাক কেটে দিয়েছে। প্যারেলের একটা মিলে নাইট শিফ্‌টে কর্মরত একজন মজুর ঝিমুচ্ছিল—মেশিনে বেচারার হাত কাটা পড়েছে। এছাড়া গভর্ণরের উপস্থিতিতে রজনীবালার ডান্স-ড্রামা 'শকুন্তলা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক ডিনারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী ফসল ব্যবসায়ীদের প্রতি দেশ ও রাষ্ট্রসেবার আবেদন জানান। তাজমহল হোটেলে চিড়িয়াখানার সাহায্যার্থে একটা ফ্যান্সী ড্রেস ড্রামা অনুষ্ঠিত হয়। আর কোন খবর নেই। রাত্রে বোম্বাইয়ে হয় বা কি—কিচ্ছু নয়। একেবারে নিষ্প্রাণ শহর—এ ডেড সিটি।

'ডেড সিটি!' রোজী ভাবে, শহরটা মরে গেছে। আমিও মরে গেছি। এসব রাস্তার আলো নয়, জ্বলজ্বলে ভূতের চোখ—কবর ও শ্মশানের ধারে-কাছে ঘুরে বেড়ায়।

ফুটপাথে হাঁটতে-হাঁটতে সে হোঁচট খায়। চোখ তুলে দেখতেই সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। মাইল-মাইল সার-বাঁধা লাশ পড়ে আছে ফুটপাথে।

পুরুষ, নারী, শিশু—সব ফুটপাথের ওপর পড়ে আছে। নিশ্চল, নিষ্প্রাণ। যেন যুদ্ধক্ষেত্রে এরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে—অদ্যাবধি তারা কায়ান-হীন খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছে। ভয়ে ভয়ে সে এই সব লাশের পাশ কাটিয়ে হেঁটে রাস্তার মাঝে এসে দাঁড়ায়।

একটা মোটর গাড়ী জ্বলজ্বলে তার কাছে আসে, আর সোঁ করে তার পাশ ঘেঁষে চলে যায়।

পেছন থেকে একটা ট্যাক্সী হর্ণের শব্দ করতে করতে তার গা ঘেঁষে চলে যায়। সামনে একটা জোড়ালো আলো।

শীতের রাতের কুয়াশা চিড়ে এগিয়ে আসতে থাকে। ভাবে, এ মোটরের আলো নয়। রাতের মায়াবী বিচ্ছুরণ! আমায় তার নরম কোলে তুলে নেয়ার জন্য এগিয়ে আসছে। আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার মুক্তি।' রোজী তার হাত দুটি জোড় করে, ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশের চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র পরস্পর আঘাত খেয়ে সৃষ্টির মাঝে ভগ্ন কণা ছড়িয়ে পড়ে।

*　　　*　　　*

'ড্রাইভার, ট্যাক্সী বেঁধে।'

ট্যাক্সী তখন হাজী আলির মোড় থেকে ওয়র্লির দিকে চলেছে, অর্জুন চেঁচিয়ে দাঁড় করায়। ব্রেক কষতেই অর্জুন গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে। তার মনে হয়, মোটর দুর্ঘটনায় তার নিজের কোন গভীর সম্পর্ক-সূত্র আছে।

মোটরের কাঁচের টুকরো ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় বহুদূর অব্দি ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তা ছেড়ে মোটর ফুটপাথে উঠে এসেছে, এসে একটা ল্যাম্প পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে। সামনের চাকা দুটি মাটি ঠেকে রয়েছে, আর পেছনের চাকা দুটি শূন্যে ঝুলন্ত। একটা চাকা এখনও ঘুরছে, আর তা থেকে থেঁৎলে যাওয়া রক্ত ফোঁটা ফুটপাথে চুঁয়ে পড়ছে।

পাশেই একজন পুলিশ পাহারারত।

'হাবিলদার জী, কি হয়েছে ?'

'বারোজন লোক মারা গেছে, সা'ব।'

'বারোজন ?' এই ছোট্ট গাড়ীতে বারোজন লোক বসেছিল নাকি ?

'না সা'ব, মোটরে শুধু দুজন ছিল—একটা সাহেব আর একটা মেম। মেমটা দারুণ সুন্দরী। ইন্সপেক্টর সা'ব বলছিল মেমটা নাকি কোন এক হোটেলে গান গায়।

অর্জুন বলে ওঠে—'লুসী।'

'হ্যাঁ, সা'ব। ঐ রকমই একটা নাম বলছিল। কিন্তু সাহেবটা একেবারে পাঁড়-মাতাল, মুখ থেকে ভকভকিয়ে হুইস্কীর গন্ধ আসছিল। সাহেবের পকেট থেকে হাজার টাকা নোটের আটখানা নোট বেরোয়। বড়লোক ছিল

বলে মনে হয়।

অর্জুন বলে ওঠে, 'জোসেফ, আসল নাম মাইকেল।'

'আপনি জানলেন কি করে, সা'ব ?'

'হাবিলদার জী, জানো মাঝে মাঝে এই রাত্রি আমাদের কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে রহস্যসূত্র বলে দেয়।...কিন্তু, দুজন তো হলো—আর কে কে মারা গেছে ?'

একটা ক্রিশ্চান মেয়ে—মাঝরাস্তা ধরে বেচারী হেঁটে যাচ্ছিল, মোটরের ধাক্কায় সে বেচারীও তলায় পড়েছে।

'কেমন দেখতে ছিল বলোত ?'

'রোগা ঢ্যাঙা, ফ্যাকাশে।'

'মাজা-মাজা রঙ, ডাগর চোখ...'

'হ্যাঁ সা'ব, বড় জোর ষোল-সতরো বছর বয়স হবে। কিন্তু সা'ব, সেটাও এক নম্বরের মাতাল। তাকে বাঁচাবার জন্যই হয়তো ঐ সাহেব ব্রেক কষেছিল...'

'সাহেব ব্রেক কষেনি হাবিলদার জী! এটাই তো জীবনের ট্রাজেডি।... বাকী ন'জন আর কে কে ছিল ?'

'একটা গোটা পরিবার—এই ফুটপাথে শুয়ে ছিল—বাপ-মা, আর সাতটা বড়-ছোট ছেলে। সবকটাকে পিষে থেঁৎলে চলে গেছে। ঐ দেখুন, এখনও ওদের রক্ত পড়ে আছে।

হাবিলদারের ইশারায় লক্ষ্য করে অর্জুন দেখতে পায়, একজন লোক জলের পাইপ দিয়ে সে জায়গাটা ধুচ্ছে।

'জল দিয়ে কি এ রক্ত ধুয়ে মুছে ফেলা যাবে ?'

হ্যাঁ সা'ব। অনেক রক্ত, একটু 'টাইম' লাগবে, তবে ধুয়ে মুছে ফেলবে।

না হে, অত সহজ ব্যাপার নয়। বড় মুশকিল, বড় মুশকিল ভাই—এ রক্ত জলে ধুয়ে মোছা যাবে না।'

ট্যাক্সীতে বসতে যাচ্ছিল অর্জুন, ঘাড় ফিরিয়ে দেখে—সমুদ্র ফুলে-ফুলে গুমড়ে উঠেছে, আর ঢেউ বেলাভূমিতে মাথা ঠুকরে-ঠুক্‌রে ফিরে যাচ্ছে বারবার।

*   *   *

'উষা, ওঠো।'

'কি হলো ?'

'কিছু নয়, আস্তে কথা বলো, নইলে ছেলেমেয়েরা উঠে পড়বে। চলো কিচেনে, আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

গ্যাসে ডিম ফ্রাই করার সময় ছ্যান-ছুন ছ্যান-ছুন মৃদু শব্দ জাগে।

অর্জুন বলে—'ঊষা মনে আছে, আমাদের বিয়ের রাতে অতিথিদের সামনে তুমি লজ্জায় কিছু খেতে পারনি, তারপর মাঝরাতে তোমার ক্ষিধে পেয়েছিল—আমি তোমাকে ডিম ফ্রাই করে খাইয়েছিলাম ?'

'আমার সব মনে আছে।'

'চৌপাটিতে গিয়ে রোজ চাট-ফুলুরী খেতাম।'

ঊষা স্মিত হেসে মাথা নাড়ায়।

'বেনারসী পানের দোকানে গিয়ে সুগন্ধী পান খেতাম।'

ঊষা মাথা নাড়িয়ে জানায়, 'এখনও সে পানের কথা মনে আছে।'

'মালাবার হিল্‌সের সেই বেঞ্চটা—যার ওপর আমরা দুজনে বসে গল্প করতাম।'

লজ্জায় ঊষার গাল লাল হয়ে আসে। 'সে সব কথা এখন তুলছো কেন বলোত ?'

'কারণ কাল থেকে আমরা আবার রোজ সন্ধ্যায় চৌপাটিতে চাট-ফুলুরী খেতে যাবো।'

'আর সুগন্ধী পান ?'

'হ্যাঁ, সুগন্ধী পান খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারপর মালাবার হিলস্‌-এ যাবো, বেঞ্চে বসে গল্প করবো।'

'তোমার অফিস··· ?'

'তাও চলবে। ভালবাসার চেয়ে জরুরী কোন কাজ নেই ঊষা, বুঝলে।'

'এই সব পুরনো পাঠ তোমায় আবার কে মনে করিয়ে দিল ?'

'একজন বৃদ্ধ লোক—ষাট বছর ধরে বোম্বাই আসার কথা কেবল মনে পুষে রেখেছিল। অথচ দেখ, বোম্বাই পৌঁছানোর পাঁচ মিনিট আগে হার্টফেল করে মারা গেল। বোম্বাইয়ের রাত সে আর দেখে যেতে পারলো না। অবশ্য পকেটে ত্রিশ হাজার টাকা ছিল।

'তোমার কাছে আছে কি ?' ঊষা হেসে জিজ্ঞেস করে।

'কেন ? ত্রিশ টাকা আছে, আর···'

'আর···'

'তুমি আছো।'

'হুঁ, তারপর ?'

'আমার কাছটিতে এগিয়ে এসো।'

'এই তো এসেছি।'

'আরোও কাছে।'

'তুমি যে কাঁপছ দেখছি। তোমার বুক আরও জোরে কাঁপছে।'

'হ্যাঁ ঊষা, রাতে আমার বড্ড ভয় করে। তোমার বুকের মাঝে আমায় জড়িয়ে ধরো, ঊষা।'

চকলেট ও সময়

জাহাঙ্গির আর্ট গ্যালারীতে আজ অসম্ভব ভিড়। শিল্পী সুধীরের ছবির একক প্রদর্শনী। বহুদিন পর সে য়ুরোপ, আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ ভ্রমণ শেষ করে ভারতে ফিরে এসেছে। সেখানে তার প্রচুর সুনাম ও খ্যাতি মেলে। তার আঁকা ছবি ন্যুয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন এবং মস্কোর আর্ট গ্যালারীর শোভা বৃদ্ধি করেছে। হলিউডের মেরিলিন মনরোর প্রতিকৃতি [মৃত্যুর দিন কয়েক পূর্বে] সে তেলরঙে এঁকেছিল। পোপের অভিষেক উৎসব উপলক্ষে খৃষ্ট ধর্মের সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক নেতার প্রতিকৃতি এঁকেছিল। এবং তার শিল্পোৎকর্ষের প্রতি যারা তীব্র বিমুখ—তার শিল্পগত আধুনিক ও অর্থময় রীতি-প্রয়োগ ইত্যাদি স্বীকার করে না, তারা একযোগে সমস্বরে জানাতে দ্বিধা করে নি—যদি ঐ ছবি দুটোর উপর কোন ক্যাপসন বা টাইটেল না থাকতো, তাহলে হয়তো বলা অসম্ভব হতো—কোনটা পোপের প্রতিকৃতি এবং কোনটা মেরিলিন মনরো'র।

এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের সাংবাদিককে ইণ্টারভিউ'র সময় সুধীর জানিয়েছিল, আর্ট কোন অঙ্কের হিসেব নয়, অ্যালজেব্রার ফর্মুলা নয়, জিওমেট্রির ড্রইংও নয় যে তাকে ধরাবাধা গৎ-এ ওজন করা যায়। আর্টিস্টের কাজ ফটোগ্রাফীও নয় যে বস্তুগত ও ছবির মাঝে একটা সাম্যভাব উপস্থিতি করা একেবারে প্রয়োজনীয়। এই সঙ্গে সে এও জানিয়েছিল, যারা জাপানী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা জাপানী সাহিত্য সম্পর্কে কোন মতামত জাহির করতে পারে না, যারা আর্টের ইতিহাস ও টেকনিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, তাদের আর্ট সম্পর্কে কোন মতামত না-জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ইণ্টারভিউয়ের বিবরণে শহরে শিল্পক্ষেত্রে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শিল্প-সম্পর্কে সুধীরের এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নানান আলোচনা চলে। কেউ কেউ সুধীরকে শিল্পক্ষেত্রে ভয়ানক ফাঁকি, আবার কেউ কেউ তাঁকে জিনিয়াস অ্যাখ্যা দিয়েছে। তবুও তাদের মধ্যে অনেকে এমন ছিল, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা সুধীরের সঙ্গে একমত, এবং শিল্প-ক্ষেত্রে তাঁকে সশ্রদ্ধ পাওনিয়র ও পুরোধা রূপে স্বীকার করে নেয়।

নানা জনের নানা মত। বিশেষ করে আর্ট গ্যালারীর দ্বার যখন সকলের জন্য অবারিত।

কালোটুপী মাথায় এক দর্শক, সম্ভবতঃ সে সরাসরি ফাটকা বাজার থেকে ছুটে এসেছে—একটা ছবির দিকে বহুক্ষণ ধরে দেখেশুনে তার সঙ্গীকে বলে—গোলাপী বাছুর? হিঃ হিঃ। বাঃ। বাছুর আবার কখনো গোলাপী হয় নাকি?

সঙ্গী জানায় ঃ 'শিল্পীর কল্পনায় বাছুর গোলাপী হয়, আবার হলদেও হয়। কেবল একটি ব্যাপারে তা নির্ভর করা চলে, দ্যাট ইজ্, আর্টিস্ট ক' পেগ গলায় ঢেলে ছবিতে হাত দিয়েছে।'

'ছবির দামটা লক্ষ্য করেছো।' ফাটকা-বাজারের দর্শক নাক সিঁটকে বলে—'সাড়ে তিন'শো টাকা। পঞ্চাশ-ষাট টাকা ফেললে একটা জ্যান্ত বাছুর কেনা যায়।'

লম্বা নাকের উপর পুরু লেন্সের চশমা পড়া—এক ভদ্রলোক ওদের কথার মাঝখানেই বলে ওঠে—'জ্যান্ত বাছুর কোন একদিন নিশ্চয়ই মারা পড়বে। কিন্তু, এই গোলাপী বাছুর, শৈশবের স্বাধীনতা ও নির্ভাবনার প্রতীক—সব সময় এই ছবিতে একইভাবে চঞ্চল, উজ্জ্বল ও সজীব থাকবে।'

অন্য একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে জনাকয়েক দর্শক বেশ গম্ভীর ভাবে তার মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। ছবির টাইটেল ঃ মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ।

প্রতিটি কোণ থেকে ছবিটাকে দেখার পর একজন যুবক সহসা বলে ওঠে—'ঘণ্টাগুলো কোথায় ? একটাও ঘণ্টা যে দেখা যাচ্ছে না।'

সামনেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিল, তার মাথার দীর্ঘকেশ 'কবি' বলে পরিচয় দিচ্ছিল, সে বলে ওঠে—'মন্দিরের ঘণ্টা এখানে নেই, কেবল ঘণ্টার শব্দ আছে।' তারপর ছবির দিকে ইশারা করে বোঝায়—'এই যে দেখুন, রঙিন বৃত্ত কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ ঘণ্টার শব্দ দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃত্তগুলো আলাদা-আলাদা, অথচ সম্পূর্ণ নয়, বরং একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে তার গুঞ্জন আছে, অনুরণন আছে। এবার রঙের ব্যবহার দেখুন। এই যে তামাটে রঙের ব্যবহার, তার অর্থ হলো……।'

এক্সীবিশনে সবচেয়ে বেশী ভিড়—প্রমাণ সাইজের একটি ছবির সামনে, যার তলায় কাগজ আঁটা ছিল—নট ফর সেল। ছবির ক্যাপসন ; শৃঙ্গার।

সুধীরের অন্যান্য ছবিগুলি যদি শিল্পের আধুনিক য়ুরোপিয়ন আঙ্গিক ও রীতি-নীতির প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, তাহলে এই ছবি ভারতীয় ওরিয়েণ্টাল রীতিতে আঁকা এবং এক্সীবিশনে চারদিকে টাঙ্গানো 'ইম্প্রেশনিষ্ট' ও 'সুররিয়লিস্ট' ছবির মাঝে মনে হয় 'টুইস্ট' বা 'জাজ' সঙ্গীতের সুতীব্র আলোড়ন মাঝে কেউ যেন বাঁশীতে মৃদু সুরে ভৈরবীর তান তুলেছে।

শীর্ণ নরম, গোলাপী রঙের একটি কমনীয় কিশোরী, লাল-পাড়ের শ্বেত-শুভ্র শাড়ি পরনে, কাঁধে একটা হলদে তোয়ালে জড়িয়ে সবে স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে। তার ঘন, দীর্ঘ, উজ্জ্বল কালো কেশদাম বেয়ে মুক্তোর মত জলবিন্দু চুঁয়ে পড়ছে। প্রস্ফুটিত যৌবন শাড়ি ফেটে বেরিয়ে পড়ছে। শা। ও ব্লাউজের মাঝে অনাবৃত কোমর ও সূক্ষ্ম শাড়ির নীচে সুগোল,

সুঠাম যৌবনতপ্ত একজোড়া পা—যদিও তা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। গোলাপী চেহারা, মুখের উপর একগুচ্ছ ভেজা চুল এসে পড়েছে, মেয়েটি হাত দিয়ে সরাতে যাবে—এমন একটা ভাব, কিন্তু সরাতে পারছে না, কারণ সে নিজের প্রতিকৃতি দেখার জন্য আয়নায় যেই মুখ তুলেছে, অমনি সহসা থমকে দাঁড়িয়েছে—জীবনে এই প্রথম সে তার সৌন্দর্যের আভাস পেয়েছে। আনমনেই তার ঠোঁটে মৃদু, অস্পষ্ট, লজ্জারাঙা হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। সৌন্দর্য্যের এই আবিষ্কারের মুহূর্তটুকু এই ছবিতে চিরদিনের মত মূর্ত হয়ে উঠেছে, যেন কারো স্মৃতি আজীবন হৃদয়ে বন্দী করে রেখেছে।

'হ্যাঁ, বন্দীই বটে।' দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে সুধীর তার আঁকা ছবি দেখতে দেখতে ভাবে 'মীনাক্ষী আদপেই জানে না, অথচ ওকে এই ছবির মধ্যে আজীবন আমার হৃদয়ে বন্দী করে রেখেছি।'

কোথাও কোনও এক্সীবিশন হলে সুধীরের নিয়ম ছিল, সে এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে দর্শকদের মতামত শুনত—নিজের এবং ছবি সম্পর্কে। তার ধারণা, এ ভাবে নিজের শিল্প সম্পর্কে দর্শকদের কাছ থেকে প্রকৃত ও নিরপেক্ষ সমালোচনা শোনা যায়—সংবাদপত্রের পেশাধারী সমালোচকদের বাধাধরা দীর্ঘ আলোচনায় যা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

'শৃঙ্গার' দেখার সঙ্গে সঙ্গে আর্ট স্কুলের একজন ছাত্র সহসা বলে ওঠে—'বাঃ' কি অপরূপ সুন্দর মেয়ে দ্যাখ! আর্টিস্টের কাছ থেকে ঠিকানা চেয়ে এই মডেলের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।'

দ্বিতীয় জন বলে, 'এই হোলি বিউটি কি আর মডেলদের মধ্যে পাওয়া যায়। ও নিশ্চয়ই সুধীরের ফিয়াঁসে।

অদূরে দাঁড়িয়ে সুধীর ওদের কথা শুনে মনে-মনে হেসে ফেলে। ভাবে, 'মীনাক্ষীর কানে গেলে ও নিশ্চয়ই দারুণ রাগ করত।'

তরুণ ছাত্রটি ছবিটাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করে বলে, 'কিন্তু, একটা ব্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। অন্যান্য ছবিগুলি মডার্ন আর্টের রীতিতে আঁকা, অথচ এ ছবিটা দারুণ রোমান্টিক—ওরিয়েন্টাল রীতিতে আঁকা।

সঙ্গী বলে, 'আসলে ছবিটা বহুদিন আগেকার আঁকা—সুধীরের যৌবন কালে। সম্ভবতঃ সে সময় কলেজে পড়ত। নিজস্ব স্টাইলও ভালভাবে ম্যাচুওর হয়নি। ছবিটা শিল্প-দৃষ্টিতে বিশেষ কোনও মূল্য নেই। রবি বর্মার ক্যালেণ্ডারের মত যেন সাধারণ একটা ছবি।

'তা সত্ত্বেও এ ছবিটার সামনেই এত ভিড়? সকলেই কিন্তু এই ছবিটা দেখার জন্য উন্মুখ! কেন বলতো?'

'ছবির মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী।'

'এই একমাত্র কারণ নয় ভাই। শিল্পী খুব দরদ দিয়ে এ ছবিটা এঁকেছে।

নিশ্চয়ই সে মেয়েটাকে ভালবাসে।'

'তাছাড়া প্রতিটি দর্শক এই ছবিতে তাদের প্রেমিকা ও প্রেম-এর যৌথ ছায়া দেখতে পায়।'

'শিল্পী তার হৃদয়-বাসনা দর্শকদের মনেও স্থাপিত করতে পেরেছে—এও শিল্পের সাফল্য!'

'ছবিটা দেখা হয়েছে তো! এবার এসো, তোমায় সত্যিকারের একটা মাস্টারপিস ছবি দেখাচ্ছি—মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ…।'

মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ…।

ঘণ্টার শব্দ।

সুধীরের স্মৃতিপটে ঘণ্টা বেজে ওঠে—মন্দিরের ঘণ্টা! এবং লাল-নীল-হলুদ ধ্বনি-বৃত্ত ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে।

ছেলেবেলা ছাড়া সুধীর আর কখনও মন্দিরে যায়নি, অথচ মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ তার অবচেতন মনে ছেয়ে আছে।

মীনাক্ষীদের বাড়ীর পাশেই মন্দির।

আর্ট স্কুলের নিতান্ত দরিদ্র এক ছাত্র, ড্রইং-এর টিউশন করে কলেজের টিউশন ফি জমা দিত। মীনাক্ষী ধনী পিতার একমাত্র সন্তান।

প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় সুধীর ড্রইং শেখাতে যেত মীনাক্ষীকে, ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠত প্রচণ্ড শব্দে।

সারাটা দিন সুধীর এই অন্তরঙ্গ সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষায় কাটাতো। মীনাক্ষীও সম্ভবতঃ তার প্রতীক্ষা করতো।

বাইরে মন্দিরে যখন ঘণ্টা বেজে উঠত, ঠিক সেই সময় সুধীর ঘরে পা দিত। শাড়ির আঁচল সামলে চঞ্চল পায়ে ড্রইং-এর খাতা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াত। সুধীর বলতো, 'মীনাক্ষী, ড্রইং শেষ করেছো তো?' মীনাক্ষী হেসে ছোট্ট জবাব দিত—'হ্যাঁ, কিন্তু দেখাবো না। আগে আমায় চকলেট দিন।' পকেট থেকে সুধীর চকলেট বের করে হেসে বলতো—'এই নাও তোমার চকলেট…কম করে খেও, নইলে কিন্তু ভীষণ মোটা হয়ে পড়বে, বুঝলে।' সেও হেসে উঠত উচ্ছলতায়। চকলেটের ওপরে পাতলা মোড়ক ছাড়িয়ে মুখে পুড়ে ফেলত। সুধীর তারপর ড্রইং শেখাতে শুরু করত। কাগজের উপর পেন্সিল-রঙের আকৃতি গড়ে উঠতে, তার বুক কাঁপত সাংঘাতিক দ্রুত ভাবে, মীনাক্ষী কিন্তু নির্বিকার চকলেট চিবিয়ে চলত।

মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ শেষ হলেই, সুধীর বুঝতে পারত—এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। এবার মীনাক্ষীর মা খাবার খেতে ডাকবেন। ঘণ্টার শব্দ থেমে পড়ার পর সেই নিঃশব্দ পরিবেশে সুধীরের বড় ভয় হত, পাছে কেউ তার বুকের কাঁপুনি ধরে ফেলে। সহসা উঠে দাঁড়াত: 'আচ্ছা মীনাক্ষী, এবার

চলি, কাল আবার আসবো। তুমি এই ড্রইংটা তৈরী করে রেখো।' মীনাক্ষী জবাব দিত ছোট্ট করে ঃ 'আচ্ছা! কিন্তু, আমার চকলেট আনতে ভুলবেন না যেন।'

হ্যাঁ, সেই শেষ-সন্ধ্যার দিন-দশেক পরে সুধীর মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। দশটা দিন ও দশটা রাতে সে 'শৃঙ্গার' সৃষ্টি করেছে। ভেবেছিল, আজ সে মীনাক্ষীকে বলবে—'চলো, আজ তোমায় একটা নতুন ক্রিয়েশন দেখাবো। তার পূর্ণ বিশ্বাস, একবার মীনাক্ষী যদি সেই ছবিটা দেখে, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে সুধীর তাকে কত ভালবাসে। ছবিটা শুধু শিল্প-কীর্তিই নয়, শুধু মীনাক্ষীর নিটোল সৌন্দর্য্য নয়—তার প্রেমের পরিপূর্ণ প্রকাশ ছড়িয়ে পড়েছে—মীনাক্ষীর প্রতি তার যা-ভাবনা, অথচ যা আজও ব্যক্ত করতে পারে নি। আজ সে ভেবেছে, এই ছবিই আমার তরফ থেকে প্রেমের ঘোষণা সোচ্চার করে তুলবে। কিন্তু, মীনাক্ষীকে সে ছবিটা দেখাবার সুযোগ পায়নি।

মীনাক্ষীদের বাড়ীতে সে যখন যায়, রোজকার মত সেদিনও মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছিল। দুগালে তার খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, দশটি বিনিদ্র রাত কাটাবার ফলে চোখ জোড়া রক্তবর্ণ।

'কি হয়েছে তোমার সুধীর?' মীনাক্ষীর বাবা প্রশ্ন করে। 'জ্বর হয়েছিল নাকি? কবে থেকে আসছ না?'

'আজ্ঞে না, ভালই আছি। একটা ছবি নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলাম। মীনাক্ষীকে দেখ্‌ছি না? ওকি আজ ড্রইং শিখবে না?'

'না, সুধীর, এখন ওর লেখাপড়ার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।' মীনাক্ষীর মা মিষ্টির প্লেট এগিয়ে দিয়ে বলে—'নাও, মিষ্টি খাও। আজ মীনাক্ষীর পাকা দেখা ও আশীর্বাদ হয়ে গেল। ছেলে···।'

সহসা মন্দিরে ঘণ্টার শব্দ তার কানে জোরে বেজে ওঠে, সে আর কিছুই শুনতে পায় না। ছেলে কে, কি করে, কবে বিয়ে—তার মা হয়তো এসব কথা বলে থাকবে, কিন্তু সুধীরের কানে শুধু মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ বাজতে থাকে।

মীনাক্ষীর সঙ্গে সে শেষ দেখা করেছিল সেদিনই, মীনাক্ষী আগের মতই বলে উঠেছে—'আমার চকলেট কোথায়?' তক্ষুনি প্যাকেট থেকে চকলেট বার করে সে প্রতিবারের মত জবাব দিয়েছিল, এই নাও তোমার চকলেট! কম করে খেও! নইলে কিন্তু মোটা হয়ে পড়বে।' কথাগুলো বলার সময়, অন্যদিনের মত ঠোঁটে তার হাসির রেখা ফুটে ওঠে নি।

সেদিন শেষবারের মত মীনাক্ষীদের বাড়ী থেকে যখন সে বেরিয়ে আসে, মন্দিরে আরতি তখনও চলছে, ঘণ্টা বেজে চলেছে গম্ভীর শব্দে।

সেদিন থেকে ঘণ্টার শব্দ ক্রমাগত তার অবচেতন মনে বেজে ওঠে।

লক্ষ্মৌ ছেড়ে দিল্লী চলে আসে, তবুও ঘণ্টার শব্দ তার কানে বেজে চলে। খবরের কাগজ মারফৎ জানা যায়, রায় বাহাদুর কামতা প্রসাদের কন্যা মীনাক্ষীর শুভবিবাহ শ্রী লক্ষ্মীকান্ত, আই. সি-এস, জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়েছে।

দিল্লী থেকে তারপর বোম্বাই। কয়েক বছর সে ওরিয়েণ্টাল আর্ট ও ভাস্কর্য নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনার জন্য অজণ্তা ও ইলোরার গুহায় কাটিয়ে দিল। সেখানেও সেই ঘণ্টার শব্দ তাকে আক্রমণ করতে ছাড়ে না।

য়ুরোপে যুদ্ধ শুরু হলো। বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ। ভারত স্বাধীন হলো। স্কলারশিপ নিয়ে সুধীর বোম্বে থেকে প্যারিসে পাড়ি দিল। বছর কয়েক সেখানে কাটাল, তবুও ঘণ্টার শব্দ তার কানে বেজে চলত।

মাঝে একবার ভারতে ফিরে এসেছিল। বোম্বাইতে ছিল তখন, খবরের কাগজে জানা গেল লক্ষ্মীকান্ত কোন এক সরকারী পদে বোম্বাইতেই নিযুক্ত। একদিন, তাঁকে একজন ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। আমন্ত্রিত লোকেদের তালিকা জানিয়ে বলে, 'মিস্টার ও মিসেস লক্ষ্মীকান্তও এই ডিনারে উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে আপনি নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন। তাঁরাও আপনার ওদিককার বাসিন্দা। এবার মন্দিরের ঘণ্টা এত সশব্দে বেজে ওঠে, সুধীরের সমগ্র কান একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ করে ওঠে। শরীর খারাপের অজুহাতে সেই নিমন্ত্রণ থেকে সে নিষ্কৃতি পায় এবং পরের সপ্তাহেই ইংলণ্ডে চলে যায়।

মীনাক্ষীকে ভোলার জন্য এবার সে অন্য কারো সঙ্গ কামনা করে। এখন তার কাছে প্রচুর অর্থ। শিল্পক্ষেত্রেও এখন তার প্রচুর খ্যাতি। বহু সুন্দরী ও অভিজাত রমণীর সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় ঘটেছে। তাদেরই একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। মেরী মারশাঁ সুন্দরী ফরাসী নারী—ইংরেজী শিক্ষার জন্য লণ্ডনে এসেছে। সুধীর একদিন ওকে তার স্টুডিয়োতে নিয়ে যায়—বড় একটা ক্যানভ্যাসে তখন 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' নিয়ে ব্যস্ত ছিল। স্টুডিয়োর সব ছবি দেখার পর মেরী বলে ওঠে—'এগুলো তো মডার্ন য়ুরোপিয়ন আর্ট। তুমি কি পুরোনো ওরিয়েণ্টাল স্টাইলে ইণ্ডিয়ান আর্টের কোন ছবি আঁকো নি?'

সুধীর বলে—'হ্যাঁ, এঁকেছিলাম। কিন্তু সে সব কোন কাজে লাগবে না ভেবে ভারতেই রেখে এসেছি। তবে সেই স্টাইলের একটা ছবি আমার কাছে রয়েছে।'

মেরীকে সে 'শৃঙ্গার' দেখিয়েছিল। মেরী তার নিটোল দৃষ্টি তুলে বহুক্ষণ গম্ভীর ভাবে ছবিটাকে দেখে, তারপর উত্তর না দিয়ে সে উঠে চলে যায়। সেই রাত্রেই সুধীরকে একখানা চিঠি লিখে জানায় সে, 'আমি সেই সুন্দরী ভারতীয় মেয়ের স্মৃতির সমকক্ষ নই। তোমার সেই ছবিটা যেন সোচ্চার

ভাবে বলছে, তুমি কেবল তাকেই ভালবাস। অন্য কাউকে তুমি ভালবাসতে পারো না…।'

লণ্ডনে অতিষ্ঠ হয়ে সুধীর নিউইয়র্কে যায়। সেখানেও শিল্পী সমাজ তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানায়। সমালোচকরা তার ছবির দারুণ প্রশংসা করে। বহুসংখ্যক ছবি বেশ চড়া দামে বিক্রী হয়। সুধীরের এখন আর আর্থিক অসঙ্গতি থাকে না। অথচ মনে এক ধরনের অস্থিরতা ছেয়ে থাকে সবসময়। প্রতি পদক্ষেপে একধরনের অস্থির-বোধ তাকে বিচলিত করে। কানের কাছে আজও মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ বাজে। সেই অবিরাম শব্দ-ধ্বনি তার ক্যানভাসে রঙীন বৃত্তে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তার আঁকা ছবি 'মন্দিবের ঘণ্টার শব্দ'—শিল্পজগতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। একজন সমালোচক লিখে বসে "শিল্প-চেতনায় এই চিত্রে এক নতুন যুগের উন্মেষ দেখা দিয়েছে।"

তারপর সে গোটা আমেরিকা ঘুরে বেড়ায়। ক্যানাডা থেকে ম্যাক্সিকো। ম্যাক্সিকো'র বোদ এবং ধুলো ভারতের স্মৃতি মনে পড়িয়ে দেয়। সেখানকার আর্ট তাকে গভীর ভাবে ইমপ্রেস কবে। দু'টি বছর সে ক্যানাডার গ্রামে-গ্রামে, সেখানকার কালো চুলের সুন্দরী বাদামী মেয়েদের, 'বুল-ফাইটে'র রক্তাক্ত ছবি আঁকে। ম্যাক্সিকোও একসময় একঘেয়ে হয়ে ওঠে, আবার বেড়িয়ে পড়ে। এবার হাজির হয় হলিউডে। বিখ্যাত সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রীদের সঙ্গে আলাপ ঘটে। মেরিলিন মনরো'কে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বলে ওঠে, 'মিস মনরো, আমি আপনার একটা ছবি আঁকতে চাই।' মেরিলিন বলে, 'আপনিও কি শেষে আমার নগ্ন-শরীরকে আর্টের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চান?' জবাবে সুধীর বলেছিল—'আপনার শরীর সম্পর্কে আমার কোন কৌতূহল নেই। আপনার আহত-আত্মাকে আমি ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে চাই—আপনার মৌন আঁখি জোড়ায় যার উজ্জ্বল প্রকাশ। শ্বেতশুভ্র দীর্ঘ গাউন পরনে মেরিলিনের প্রতিকৃতি সে এঁকেছিল, বিশ্ববিখ্যাত তার সম্পূর্ণ শরীর ঐ গাউনের অন্তরালে মিশে গিয়েছিল। তার বাদামী সোনালী চুল অগ্নি-শিখার মত চেহারার চারদিকে বলয় সৃষ্টি করেছে। চোখে গাঢ় বেদনার আভাস, লজ্জা-নম্র দৃষ্টিচ্ছায়া এবং পৃথিবীর নির্মমতার বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা। আঁকা ছবির সঙ্গে মেরিলিনের প্রকৃত চেহারায় কোন সাদৃশ্য ছিল না। অস্বীকার করেছিল দর্শকবৃন্দ: 'এটা মেরিলিন মনরো'র' ছবি নয়, যেন কোন দেবদূতের।' সুধীর জবাবে বলেছিল—'হ্যাঁ, সত্যি একজন দেবদূতের ছবি। যাকে কামনা-বাসনার যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়েছে।'

তারপর, সত্যি দেবদূত যূপকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করে। মেরিলিনের মৃত্যু-সংবাদ সুধীরের প্রাণে শক্ত আঘাত দেয়, দিনকয়েক সে সব দরজা বন্ধ করে

মদ খেয়ে কাটায়। হয়তো মদ খেয়েই জীবনটাকে নিঃশেষ করে ফেলত, যদি না লুসী লাতুশ সেই সময় ইণ্টারভিউ নিতে তার কাছে হাজির হতো।

লুসী—লস এঞ্জেলসের এক দৈনিক পত্রিকার আর্ট রিপোর্টার। মেরিলিন মনরো সম্পর্কে সুধীরের কাছে ইণ্টারভিউ নিতে এসেছিল। কিন্তু, দরজার কড়া নেড়ে কোন জবাব পায়নি। [যদিও হোটেলের কাউণ্টারে তাকে জানিয়েছে, সুধীর নিজের সুইটেই আছে] তারপর সে দরজায় ধাক্কা দেয়। দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে দেখে, ভারতীয় শিল্পী নেশায় একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, আর কাছেপিঠে হুইস্কীর অনেকগুলো শূন্য বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। সুধীরের চৈতন্য ফিরে আসতেই দেখতে পায়, মাথার কাছে একটি সুন্দরী মেয়ে—শুভ্র গাউন পরনে,—বসে আছে।

'কে তুমি ?' জড়ানো গলায় আচ্ছন্ন-অবস্থায় সুধীর জিজ্ঞেস করে—'স্বর্গের পরী, নাকি হাসপাতালের নার্স ?'

স্মিত হেসে লুসী তার হাত সুধীরের মাথায় রেখে বলে—'না, আমি পরী নই, নার্সও নই ! একজন রিপোর্টার মাত্র।'

সেদিন থেকেই তাদের বন্ধুত্ব। এবার সুধীরের মনে হয়, সে তার ঈপ্সিত জীবন-সঙ্গিনী পেয়েছে—এতদিন ধরে যার প্রতীক্ষা করছে। লুসী সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং বুদ্ধিমতী; সুধীরের শিল্প-কর্মে গভীর আস্থা ও মুগ্ধ-ভাবনা ছড়িয়ে আছে। প্রথমদিন থেকেই সুধীর তাকে ভালবেসে ফেলেছে। লুসী প্রায় বলে—'সুধীর, তুমি খুব বড় আর্টিস্ট অথচ তুমি একেবারে শিশু। তোমাকে দেখাশুনার জন্য অন্ততঃ একজনের দরকার।'

লুসীর আয়ত চোখে চোখ রেখে সুধীর বলে—'হ্যাঁ, তোমায় আমার প্রয়োজন।'

দীর্ঘ চুম্বনে তাদের এই প্রেম-প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরিত হয়। একজোড়া শরীর পরস্পরের মাঝে একাত্ম হয়ে মিশে যায়, আর সুধীরের মনে হয়, কেউ যেন তার আত্মার ক্ষতস্থানে প্রেমের শীতল প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়েছে।'

কিন্তু, যত দ্রুত বেগে তাদের প্রেম হয়েছিল, ঠিক সেইরকম তীব্র বেগেই প্রেমের প্রাসাদ ভেঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে গেল।

লুসীকে স্টুডিয়োয় রেখে একদিন সুধীর ক্যানভাস, পেইণ্ট টুকিটাকি কিনতে মার্কেটে যাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করেঃ 'ডার্লিং, তোমার কিছু দরকার কি, মার্কেট থেকে তাহলে নিয়ে আসবো।'

'আমার জন্য কটা চকলেট এনো।'

'চকলেট।'

'হ্যাঁ, আমার চকলেট আনতে ভুলবেন না যেন।'

ঠিক সেইমুহূর্তে মন্দিরের সবকটা ঘণ্টার শব্দ আবার কানে বেজে ওঠে।

সে আর কিছু শুনতে পায় না, লুসী কি যে বলে তাকে, কোন কথা কানে যায় না।

'ডার্লিং···সুধীর ডার্লিং! কি হলো তোমার? শরীর ভালো তো?

পরক্ষণে সে শুনতে পায় নিজেকে—'না, আমি ঠিক আছি লুসী। কিন্তু, তোমার জন্য আমি চকলেট আনতে পারবো না।'

'চকলেট আনতে পারবে না? কেন?'

'আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না, লুসী।'

এভাবে জীবনের বইয়ের সেই পাতাটাও উল্টে দেয়। আমেরিকা থেকে সুধীর য়ুরোপে আসে। বার্লিন, রোম, প্যারিস হয়ে অবশেষে লণ্ডনে। ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় সংবাদপত্রের পাতা ওলটাতে সে এ খবরটা পড়ে—

বোম্বাই ঃ গতকাল রাত্রে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নিউ ইণ্ডিয়া মিলস্‌-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রী লক্ষ্মীকান্তের মৃতু হয়। রিটায়ারের পূর্বে তিনি আই. সি. এস অফিসার ছিলেন। তিন বৎসর নিউ ইণ্ডিয়া মিলসের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। মৃত্যুর সময় বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সমাজনেত্রী শ্রীমতি মীনাক্ষী তার স্বামীর মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন··· ।'

এবার সুধীর বোম্বাই ফিরে আসে। দীর্ঘদিন বাদে আজ তার ছবির এক্সীবিশন বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সীবিশন উদ্বোধন উপলক্ষে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে বহু নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে—সেক্রেটারী, মন্ত্রী, সম্পাদক, লেখক, শিল্পী ও সমাজসেবী। সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সকলেই এসেছে। একটা নিমন্ত্রণ পত্র 'শ্রীমতি মীনাক্ষী লক্ষ্মীকান্তকেও পাঠানো হয়েছে। সারাটা সন্ধ্যা বুকের-মনের অস্থিরতা চেপে সুধীর এক কোণে দাঁড়িয়ে তার প্রতীক্ষা করে। রাত্রি ঘন হয়ে আসে, এক্সীবিশন শেষ হবার সময় একে একে দর্শকেরা বিদায় নেয়, সুধীরের সহসা মনে হয়—শুধু আজকের সন্ধ্যা নয়, সারাটা জীবনভর সে অপেক্ষা করে আসছে··· ।

আর্ট গ্যালারীর দারোয়ান এসে বলে—'সা'ব, গ্যালারী বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছে। একজন মেমসা'ব এইমাত্র এসেছেন, যদি বলেন, তাঁকে আসতে দিই··· ।'

'বলোগে, সময় শেষ হয়ে গিয়েছে···আচ্ছা দাঁড়াও। নাম কি তাঁর?'

'নাম বলেনি, তবে এই যে তাঁর কার্ড···।'

কার্ডের উপর লেখা নাম সুধীর পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের অস্থিরতা দ্রুত হয়ে ওঠে—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁকে আসতে দাও।' দারোয়ানকে বলে সে এক কোণে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। তার কানে মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ বেজে উঠে।

দরজা খুলে দেয়। দারোয়ান ঢোকে প্রথমে, তারপর······

টাইলের মেঝের উপর হাই হিল স্যাণ্ডেলের শব্দ হয়। সুধীরের কানে মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ সহসা থেমে পড়ে। সিল্কের শাড়ি জড়ানো একজন স্থূলকায়া মহিলা, স্যাণ্ডেলের হাই হিলে শরীরটাকে একরকম নাচাতে-নাচাতে ঢোকে। একরাশ তীব্র সুগন্ধ নাকে এসে লাগে সুধীরের। স্লিভলেস ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে তার চর্বিলালিত বাহুজোড়া ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায়। থুত্‌নির নীচের দিকে সঞ্চিত মেদে আরও একটি থুতনি সৃষ্টি হয়েছে।

'এ কে?' সুধীর মনে-মনেই ভাবে! এই কি সেই মীনাক্ষী? তার মীনাক্ষী? না, না, কক্ষনো নয়।

'বলুন, কেমন লাগছে?' বিনম্র গলায় সুধীর জিজ্ঞেস করে।

স্থূলকায়া মহিলা মুখ থেকে সিগারেট হোল্ডার নাবিয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে বলে, 'মোটামুটি। এসব মডার্ন আর্ট সত্যি আমার মগজে ঢোকে না কিছুতেই।'

পায়ে-পায়ে 'শৃঙ্গার' এর কাছে এগিয়ে যায়। চৌকিতেই থমকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে। "হ্যাঁ, এই ছবিতে কিছুটা শিল্পকীর্তি আছে। সুন্দরী, কিন্তু বড্ড রোগা। কে এই মেয়ে? ।বড় চেনা-চেনা লাগছে, কোথাও যেন দেখেছি একে।"

সুধীর বলে, 'না, কাল্পনিক মেয়ে। আর্টিস্টের কল্পনায় আঁকা।'

ভদ্রমহিলা একটি হিম-নিঃশ্বাস নেয়। থ্যাংক য়ু'—বলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ায়। যেতে যেতে কি ভেবে সহসা দাঁড়িয়ে পড়ে। হ্যাণ্ড ব্যাগের মুখ খুলে, ভেতর থেকে বড় সাইজের একটা চকলেট বের করে। পাতলা সেলোফেনের মোড়ক খুলতে-খুলতে বলে, 'আপনি চকলেট খাবেন?'

'আজ্ঞে না, থ্যাংক য়ু। আমি চকলেট খাই না।'

তার ঝকমকে সাদা সুদৃশ্য দাঁতগুলো—নকল বলেই মনে হয়, তা দিয়ে বেশ খানিকটা কামড়ে বলে, 'তাই আপনি এত রোগা।' তারপর, নিজেই সহসা কাঁপা হাসি হেসে ওঠে, চকলেট চিবোতে-চিবোতে চলে যায়। উঁচু হিলের খটখট শব্দ ধীরে ধীরে মিশে যায়···ক্রমশ, রাতের নির্জনতায় হারিয়ে যায়।

গ্যালারী তখন চুপচাপ, নিস্তব্ধ। দারোয়ান সুইচ টিপে বাতি নেবাতে শুরু করেছে। এক এক করে যাবতীয় ছবি অন্ধকারে ডুবে যায়। কেবল, 'শৃঙ্গার' জেগে থাকে একটা বাতির তলায়। শীর্ণ, কোমল, লাবণ্যে ঠাসা, হলুদ-গোলাপি রঙের কমনীয় মেয়েটি—যুগ-সময়-ঘটনা থেকে মুক্ত।

দারোয়ান সেই ছবিটার বাতি নেভাতে যাচ্ছে, সুধীর বারণ করেঃ 'থাক! নেভাবার দরকার নেই।' চারিদিকে এই অসম্ভব নির্জনতা ও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সুধীরের সহসা মনে হয়, ঐ আলো নিভে গেলে, তার জীবনে কিছুই আর থাকবে না।

লায়লা-মজনুঁ

এক ছিল লায়লা। আরেক ছিল মজনুঁ।

কিন্তু, লায়লার নাম লায়লা নয়, লিলি—লিলি ডি'সুজা। মজনুঁর নাম মজনুঁ নয়, মোহন—মোহন মাহিমকর। তারা দুজনে, আর তাদের প্রতিবেশীরা 'শহর-এ আরব' এ বাস করত না। বান্দ্রা ও মাহিমের মাঝামাঝি রাস্তার ঢালু জমিতে, নোনা জলের উপসাগরের সৈকতপ্রান্তে যে সব কুঁড়ে ঘরের বস্তি আছে—সেখানেই থাকত।

আরবের মরুভূমির মত এই বস্তিতেও জলের দারুণ অভাব। দেড়'শ ঝুপড়ি ঘরে প্রায় সাত শ নারীপুরুষ, তাদের ছেলেমেয়েরা থাকত—তাদের সকলের জন্য পানীয় জলের একটি মাত্র কল। এই কল বেয়ে রোজ সকালে দু'ঘণ্টা, সন্ধ্যেয় দু'ঘণ্টা জল পড়ত। এক ক্যানেস্তারা বা এক ঘড়া জল তোলার জন্য কয়েক ঘণ্টা তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

মোহন ঘরে বাবার তক্তপোশের তলায় রাত্রে ঘুমোচ্ছিল, মা এমন সময় তাকে ঠেলে তুলে দেয়—'মোহন, অ মোহন। যা-ত বাবা, ঘড়াটাকে কলের লাইনে রেখে আয়, নইলে আর জল পাওয়া যাবে না।'

মোহনের বয়স বড় জোর ন'বছর। সারা দিন ধুলো-মাটিতে দৌড়-ঝাঁপ করে খেলে বেড়িয়েছে, ঘুমও তাই বেশ কড়া। মাঝ রাতে ঘুম থেকে তোলা সহজ ব্যাপার নয়।

'ওরে অ মোহন। উঠলি না-যে?' মা আবার তাকে ঠেলা দেয়।

'উহুঁ, একটু ঘুমোতে দাও মা। এখনও মাঝ রাত। সেই সকাল আটটায় জল আসবে।

'তাহলে, তুই শুয়ে থাক। একটু পরে তোর বাবা যখন এসে তুলবে…'

বাবার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মোহন চট্ করে উঠে বসে। পৃথিবীতে যদি কাউকে ভয় করে—সে হলো বাবা। বিশেষ করে রাত্রে—বাবা যখন মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে।

'আচ্ছা, যাচ্ছি মা।' দুহাতে চোখ কচলাতে কচলাতে সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর হাতড়ে-হাতড়ে ঘড়া নিয়ে ঝুপড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়।

রাতের নিশুতিতে গোটা বস্তি এখন ঘুমে আচ্ছন্ন। কলের চারধারে সার-সার ক্যানেস্তারা, কলসি, ঘড়ার ওপর রাস্তার হলদে আলো পিছলে এসে পড়েছে।

মোহন ভাবে, সত্যি, তার দেরী হয়ে গেছে। এরিমধ্যে সকলেই ঘড়া-বাসনের লাইন দিয়ে রেখেছে—সকাল আটটায় জল আসার কথা, তার নম্বর আসতে-আসতে হয়তো দশটা বেজে যাবে, তখন যদি জল না থাকে, তাহলে?

মোহন ইতঃস্তত চেয়ে দেখে। কেউ নেই। কলের ধার থেকে একটানা—প্রায় রাস্তা ওব্দি, জলের পাত্রের দীর্ঘ লাইন। প্রথমে উজ্জ্বল চকচকে একটা ড্রাম, তারপর লাল রঙের ঘড়া। তার পেছনে পুরনো মরচে ধরা ক্যানেস্তারা। ডালডার শূন্য টিন। তারপর কুজো একটা বালতি। ক্যানেস্তারা। ঘড়া। দুটো মগ। তিনটে বড় রঙের শূন্য কৌটো। দুটো বালতি। একটা ঘড়া ·

মোহন আবার চারদিক চেয়ে দেখে, ভাবে—কারো পাত্র সরিয়ে দিয়ে তার ঘড়াটা ঢুকিয়ে রাখে। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ে, বস্তির অলিখিত আইনানুসারে এমন কাজ সে করতে পারে না।

সবার ওপর বিশ্বাস-ভরসা আছে ; তাই, লাইনে নিজেদের পাত্র রেখে সকলেই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে। নইলে, হয়তো সবাইকে সারারাত ধরে পাহারা দিতে হতো। জলের জন্য এতটুকু বে-লাইন হলে মার-দাঙ্গা খুন-খারাপিতে গিয়ে থামে। আইনানুসারে তার ঘড়াটা লাইনের সবচেয়ে পেছনে রাখা উচিৎ। কিন্তু ভাবে, তার নম্বর আসতে আসতে যদি জল শেষ হয়ে যায়! ঘরে জল আনতে না পারলে, বাবা আর আস্ত রাখবে না।

কুছ পরোয়া নেই—সে ভাবে। সবাই এখন ঘুমিয়ে, চুপচাপ ঘড়াটা লাইনের প্রথমে ঢুকিয়ে দেয়া যাক। এই ভেবে সে কলের দিকে এগোয়। সবে একটা ক্যানেস্তারা সরিয়েছে, অমনি পেছন থেকে একটা গলা ভেসে আসে অ্যাই, অ্যাই সালা, কি বলছিস্ রে?

মোহন চমকে পেছন ফিরে দেখে, শ্যামবর্ণ রোগাটে ধরনের ছ-সাত বছরের একটা মেয়ে। পরনে ময়লা ফ্রক ; নিজের মাথার মাঝে একটা বড় লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'সাল্লা, বেইমানি করছিস, মেয়েটি লাঠি হাতে মোহনের কাছে এগিয়ে আসে, 'তোল ঘড়া, সবার পেছনে রাখ—রাখ বলছি।'

মেয়েটির মুখে আধ-ফোটা তোৎলা-কথা শুনে মোহনের হাসি পায়। 'যা পালা, আমার যেখানে ইচ্ছে ঘড়া রাখবো, তোর তাতে কি? আমায় বলার তুই কে রে?'

বলেই সে ঘড়া রাখতে উদ্যত হয়, অমনি মেয়েটি বলে ওঠে—উহুঁ, আমি তাহলে এবার চেঁচিয়ে সবাইকে ডাক দি। তোকে মারতে-মারতে খিচুরি বানিয়ে ছাড়বে।

সঙ্গে সঙ্গে মোহনের হাত থেমে পড়ে। মেয়েটি যদি চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে লোক জড়ো করে, তাহলে যে তার কি অবস্থা হবে—এটা সে জানে। প্রতিটি ঝুপড়ি থেকে লোকেরা লাঠি-সোটা ইট-পাথর নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, তারপর কোন-কিছু না-শুনেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আরবের মরুভূমির

মত, সেই বস্তিতেও এক ফোঁটা জলের জন্য দশ ফোঁটা রক্ত বইয়ে ছাড়বে।

মোহন বলে, 'আচ্ছা, তুই আর চেঁচাস নি। লাইনে সবার পেছনেই আমার ঘড়া রাখছি। হলো তো?

পুঁচকে মেয়েটা অবশ্য এত সহজে ছেড়ে দেয়ার পাত্রী নয়। লাঠিটা টেনে-টেনে সঙ্গে নিয়ে মোহনের পেছন-পেছন যায়, পাছে আবার বেইমানি না করে।

লাইনের সবশেষে মোহন ঘড়াটা রেখে বলে—'নে, এবার হয়েছে।'

'হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। এবার গিয়ে তুই ঘুমো।'

'কিন্তু, এ যে একেবারে রাস্তার ধারে। যদি কেউ আমার ঘড়া তুলে নিয়ে যায়, তাহলে?'

'সেসব তোকে ভাবতে হবে না—আমি আছি।' বলে সে চৌকিদারের মত লাঠিটা মেজেতে ঠুকে বলে, 'কেউ যদি ঘড়ায় হাত দেয়, তার মাথা ফাটিয়ে ছাড়বো, হ্যাঁ।

ঐ পুঁচকে মেয়েটার মুখ থেকে এসব কথাবার্তা শুনে মোহন জোর গলায় হেসে ওঠে।

বস্তির প্রান্তে যেখানে তারা দুজন দাঁড়িয়ে, পাশেই একটা ল্যাম্প পোস্ট। তারই আলোর বৃত্তে তারা। গোটা পৃথিবী যখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন, সে সময় শুধু জেগে রয়েছে ভালবাসা, সেই সঙ্গে তারা দুজন...একটা ন'বছরের ছেলে ও একটা ছ'বছরের মেয়ে—লিলি ও মোহন।

মোহন ও লিলি।

তোৎলা, শ্যামবর্ণ, রোগা মেয়েটার দিকে মোহন চেয়ে দেখে—পরণে ছেঁড়া ফ্রক, নগ্ন পা, শরীরের চেয়ে বড় মাপে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাইট পোস্টের আলোয় দেখা যায়—ঐ নরম চোখ জোড়া নিয়ে সে তার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে—ডাগর, সুন্দর, আয়ত চোখ দুটি। যেন হরিণীর চোখ—চিড়িয়াখানায় সেদিন মোহন, দেখেছিল, খাঁচার সামনে ছোট একটা বোর্ড—আরবের হরিণী।

লিলি মোহনের দিকে চেয়ে দেখে, পরণে আধময়লা হাফ-প্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি। মনে মনে ভাবে, ছোকরাকে বেশ লাগছে। ওর সঙ্গে ভাব করবো, ওকে আর লাঠি দিয়ে মারবো না কখনও।

আলোর বৃত্তে তারা দুজনে দাঁড়িয়ে, তাদের চারদিক ঘিরে একটা ভাগ্যের পরিধি কেউ বুঝি এঁকে দিয়েছে—যা থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

সময়ও যেন থেমে গেছে। তারা দুজনে নিশ্চুপ পরস্পরের মুখ চেয়ে—অনেকক্ষণ ধরে—অনেকক্ষণ ওব্দি......

হয়তো বা এক মিনিট।

হয়তো বা একশ বছর।
হয়তো বা পাঁচ মিনিট।
হয়তো বা পাঁচশ বছর।

*　　　*　　　*

ফাদার উইলিয়ামের দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি বাতাসে উড়ছিল—একটা উড়ন্ত পায়রার মত। তাঁর সামনে উপবিষ্ট ছেলেরা আঁক কষা ছেড়ে ফাদার উইলিয়ামের দাড়ি-নৃত্য দেখছিল—বাতাসের দৌড়াত্ম্যে কখনও তা ছড়িয়ে পড়ছিল, কখনও বা প্রমপেট মাছের মত ফুলে উঠে তোলপাড় করছিল। তার চেয়ারের ধারে ছড়ি রাখা, যার আঘাতের অভিজ্ঞতা প্রায় সব ছাত্রেরই উপভোগ করতে হয়েছে। তারা জানে, ফাদার উইলিয়াম রোজ এই ছড়িটায় তেল মাখায়, সযত্নভাবে। কিন্তু, এখন এসময় কারো মার খাবার ভয়টুকুও নেই। ফাদার উইলিয়াম এখন চেয়ারে বসে ঢুলছেন, ঘুমিয়ে আছেন। শুধু তাঁর দাড়ি জেগে রয়েছে।

ফাদার উইলিয়াম এখন যাজক নন, যাজক নামে ডাকার যোগ্যও তিনি নন। কোন একসময় হয়তো বা তিনি যাজক ছিলেন, রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল তাঁকে, কারণ মহাযাজককে তিনি বলেছিলেন—চার্চের কাজ যীশুখৃষ্টের শান্তি ও প্রেমের বাণী সকলের মাঝে বিলিয়ে দেয়া—হিন্দু মুসলমান বা হরিজনদের নানান প্রলোভন দেখিয়ে খ্রীষ্টান করা নয়।

ফলে, তাঁর কাছ থেকে যাজকের চোগা-চাপকান কেড়ে নেয়া হয়। কিন্তু, মহাযাজক তাঁর দীর্ঘ দাড়ি ছিনিয়ে নিতে পারলেন না। বর্তমানে তিনি এই বস্তিতে খোলা আকাশের নীচে স্কুল খুলেছেন। যে সব ছেলেরা সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়নি, বা যাদের বাবা-মা সরকারী বা বেসরকারী স্কুলের ফি জমা দিতে পারে না—সে সব ছেলেরা তার স্কুলে লেখাপড়া করে। ফাদার উইলিয়ামের স্কুলের কোন নাম নেই, চেয়ার টেবিল নেই, ডেস্ক বেঞ্চ—কিছু নয়। শুধু তিন ঠেঙে একটা স্ট্যান্ডের ওপর ব্ল্যাক বোর্ড। মোহন এখন, এসময়ে বোর্ডের ওপর চক দিয়ে ফাদার উইলিয়ামের উড়ন্ত সাদা দাড়ির ছবি আঁকছে।

অদূরে লিলি সুন্দর ডাগর চোখ জোড়া তুলে একদৃষ্টে—ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। কালো বোর্ডের ওপর ক্রমশঃ ফাদার উইলিয়ামের গোলাকার চেহারা, বাতাসে উড়ন্ত সাদা দাড়ি ফুটে উঠতে শুরু করে। আসলে সে মোহনকে দেখছিল। এই মুহূর্তে মোহনের তোৎলামি-দোষটুকু ছাড়া মনে-মনে সে আওড়ায়—'সত্যি, মোহন বড় ভালো ছেলে। ছবিটা বেশ সুন্দর এঁকেছে। দূর থেকে মনে হয়—এই বুঝি ফাদারের দাড়ি উড়ছে।

ছবি তখনও শেষ হয়নি, এরিমধ্যে ফাদার উইলিয়াম জেগে ওঠেন, সঙ্গে

সঙ্গে সব ছাত্র, যারা এতক্ষণ চেচাঁমেচি হুটোপুটি করছিল, সহসা সোজা দৃঢ় হয়ে বসে পড়ে। জোর গলায় তারস্বরে 'সি-এ-টি ক্যাট, ক্যাট মানে বেড়াল' পড়তে শুরু করে। মোহনের মুখ তখন ব্ল্যাকবোর্ডে, সে দেখতে পায় না—ফাদার উইলিয়াম তৈলাক্ত ছড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছে।

'মো-ও-হন!' লিলি এখন সাত বছরের, তার তোৎলামি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মোহনের গায়ে বেত পড়ার ভয়ে জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে ওঠে—মো-ও হন! ফা-দা-আ-আ-র'! মোহন চমকে পেছন ফিরে দেখে, সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠে বেত।

সব ছাত্ররা একযোগে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে—লিলি ছাড়া। মুহূর্তে তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। ধীরে-ধীরে ফাদার উইলিয়ামের চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়।

'দেখি হাত। দেখি—দেখি! মোহন।' ফাদার উইলিয়াম গর্জে ওঠে। ভয়ে মোহন হাত বার করতে চায় না, ফাদার বিচিত্র কণ্ঠে (আদেশ ও অনুরোধ মেশানো) বলেন, 'হাত দেখি মোহন, যু ফুল, হাত দেখি। নইলে আবার পিঠে বেত পড়বে।'

মোহন এগিয়ে হাত মেলে ধরে।

ফাদার উইলিয়ামের বেত বাতাসে আন্দোলিত হয়, তারপর সাই-সাই করে মোহনের হাতের চেটোর ওপর এসে পড়ে।

লিলির উপস্থিতিতে মোহন কোন রকম দুর্বলতা বা অসহায়তা প্রকাশ করতে চায় না। বেতের দাগ তার হাতের ওপর ফুটে ওঠে, মনে হয় বিষাক্ত কোন সাপ বুঝি তার হাতে কামড়েছে। তবুও মোহন ঠোঁট কামড়ে চুপ থাকে. মুখ দিয়ে এতটুকু উঃ আঃ করে না।

কিন্তু মাঝপথেই, এগিয়ে যেতে-যেতে লিলি আর্তনাদ করে ওঠে, আঘাতটা যেন তার হাতেই এসে পড়েছে।

ওয়ান।

টু।

থ্রি।

ফোর।

ফাদারের বেত চারবার শূন্যে আন্দোলিত হয়, এবং প্রতিবারই মোহনের হাতের চেটোর ওপর এসে পড়ে। যন্ত্রণা চেপে, ঠোঁট কামড়ে মোহন চুপ করে থাকে, অথচ লিলি প্রতিবার গলা ছেড়ে আর্তনাদ করে ওঠে।

'দ্যাট উইল ডু···ব্যাস, যথেষ্ট হয়েছে!' ফাদার বেতটা মেজের ওপর রেখে বলেন। তারপর, দীর্ঘ দাড়িতে আদর করে বলেন—'শোনো, তোমরা যদি আমার দাড়ির ছবি আঁকো, মনে রেখো, আমার দাড়ি এত ছোট নয়—মোহন

যতটা এঁকেছে—পাক্কা সতরো ইঞ্চি ঝুল, বুঝলে।' কথা শুনে সব ছাত্র একযোগে হেসে ওঠে। মোহনও স্মিত হেসে ঝাড়ন দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড দ্রুত মুছে ফেলে। ফাদার উইলিয়ামের দৃষ্টি এবার লিলির ওপর পড়ে, বিস্ফারিত চোখে লিলি তার দিকে চেয়ে আছে।

'ওয়েল লিলি, তোমার কি চাই ?' ফাদার উইলিয়াম নরম গলায় প্রশ্ন করেন।

'ফাদার…'

'ইয়েস মাই চাইল্ড।'

লিলি কোন উত্তর দেয় না, ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে এগিয়ে গিয়ে মোহনের হাত থেকে চক কেড়ে নেয়। তারপর নিজেই বোর্ডের ওপর ফাদার উইলিয়ামের ছবি আঁকতে শুরু করে।

সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখে—লিলির হঠাৎ কি হলো !

লিলির আঁকা ছবি মোটেই ভাল হয়নি, ফাদার উইলিয়ামের ছবি বলে মনেই হয় না। ফাদার অত মোটা নন, লম্বা নন, তাঁর গলায় অতবড় সাইজের ক্রুশ থাকে না, এমন কি তার চোখ জোড়াও অত বিশাল ও ভয়ংকর নয়। লিলির ছবিতে ঐরকম মনে হয়। কিন্তু, দাড়ি সে সতর্ক ভাবে আঁকে। শেষ করার পর ফাদার উইলিয়ামের দিকে ফিরে বলে, এবার ফুট-রুল দিয়ে আপনার দাড়িটা মেপে দেখুন।'

কথা শুনে ক্লাস শুদ্ধ ছেলে খিল্‌খিল্ করে হেসে ওঠে।

ফাদার উইলিয়াম রেগে লিলিকে জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি ?

লিলি বলে, আমি ! 'আমি লিলি।'

একটা ছোকরা ক্লাশের পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'লিলি নয় ফাদার, ও লায়লা !'

'সাইলেন্স !' গোটা ক্লাশে ভাল করে দৃষ্টি বুলিয়ে ফাদার লিলিকে বলেন, 'তুমিও শেষে এসব দুষ্টুমি শুরু করছো। তাহলে তোমায় সাজা পেতে হবে। দেখি, তোমার হাত।'

লিলি হাত মেলে ধরে।

ফাদার উইলিয়াম—যিনি এই জগৎ এবং অন্য জগতের খবরাখবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল—তিনিও অবাক-বিস্ময় চোখে দেখতে পান লিলির চেটোয় আগে থাকতেই চারটে ঘন কালসিটে দাগ আঁকা ! যেন চেটোর ওপর কোন বিষাক্ত সাপ কামড়েছে।

* * *

বিকেলে লিলি অফিস থেকে বেরোতেই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটে টেডি বয় একসঙ্গে শিস্ দিয়ে ওঠে।

আঠারো বছরের লিলিকে দেখে শিস দেয়ার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সুন্দর আয়ত চোখ জোড়া, অকৃত্রিম কুঞ্চিত উজ্জ্বল কেশদাম, ফেঁপে ফুলে ওঠা বাড়ন্ত গড়ন—আঁটসাট গাউনে তাকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে তুলেছে। ফ্রকের ঝুলের তলায় সুঠাম পা জোড়া—এমন মেয়েকে দেখে কে না শিস দেবে?

ও ধরনের ছেলেদের শিস শোনার অভ্যেস লিলির ধাতস্থ হয়েছে, দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার তাকে শিস শুনতে হয়। ওসব লোফার ছেলেদের ওপর তার কোন অভিযোগ নেই. তাকে দেখে যদি কারো শিস দেয়ার ইচ্ছে হয়—তাহলে দিক না কেন! সে অন্যমনস্ক ভাবে ব্যাগ দোলাতে-দোলাতে তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। এমন ভাবে তাকে যেতে দেখে তারাও শিস দিতে ভুলে যায়।

কিন্তু, আজ তার মেজাজ ভাল নেই। টেডি বয়েরা শিস দিতেই, লিলি আজ ফিরে দেখে, তারপর তাদের কাছে এগিয়ে যায়। লিলির চোখে ক্রুদ্ধ বহ্নিশিখা দপ্ দপ্ করে, ছোকরা তিনজনের মুখ থেকে শিসের শব্দ ততক্ষণে—হারিয়ে যায়।

'কি হচ্ছেটা শুনি?' লিলি ধমক দিয়ে ওঠে, 'লজ্জা করে না তোমাদের, লোফার কোথাকার? পুলিশ ডাকবো?'

পুলিশের নাম শুনেই তিনটে ড্রেন পাইপ প্যাণ্ট ও তিনজোড়া পয়েণ্টেড শু সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

'সোয়াইন।' তাদের পালিয়ে যেতে দেখে লিলি চেঁচিয়ে ওঠে, 'শুয়োর কোথাকার!'

তারপর, সে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যায়। তার মন-মেজাজ আজ খুব খারাপ, চাপা অসন্তোষ যেন পাথুরে ফুটপাথের ওপর আছড়ে পড়ছে, হিল তোলা জুতোর শব্দেও ছড়িয়ে পড়ছে।

'সোয়াইন! শুয়োর কোথাকার!' রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দাঁত কামড়ে এমন জোরে বলে ওঠে, যে পাশের একজন মাঝবয়েসী পথচারী ঘাবড়ে গিয়ে, তার দিকে অবাক চোখে দেখে। গালাগাল সে তাঁকে দেয়নি, এমন কি সেই টেডি-বয়গুলোর বিরুদ্ধেও নয়—তাদের অশোভন কাণ্ডকারখানাও সে এতক্ষণে ভুলে গেছে। তার রাগ ধরছিল অফিস-ম্যানেজারের ওপর। মোটা-মোটা হোৎকা, টাক মাথা—দু পাশে লম্বা চুলগুলিকে আঁচড়ে মাঝখানে টাকটাকে ঢাকার জন্য সবসময় সচেষ্ট, ব্যাঙের পেটের মত হলদে ফ্যাকাশে গায়ের রঙ, মোটা ও চর্বিবহুল হাত দুটি ঘামে সর্বদা চটচটে। অফিসের প্রতিটি মহিলা কর্ম্মীকে ফ্লার্ট করাটা সে জন্মগত অধিকার বলে মনে করে।

লিলি সেই অফিসে সবে মাস দুই কাজ করছে, এরিমধ্যে ম্যানেজারের

স্বরূপ বুঝে ফেলেছে সহজে। তাই, যদ্দুর সম্ভব, সে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। কিন্তু, আজ ম্যানেজার তার পার্শোনাল স্টেনোকে ছুটি দিয়ে লিলিকে তার জায়গায় কাজ করতে দেয়।

তিনঘণ্টা ধরে লিলি শর্টহ্যাণ্ডের খাতায় ম্যানেজারের ডিক্টেট করা চিঠি লেখে, প্রতিটি চিঠিই 'ডিয়ার স্যার বা মাই ডিয়ার...' দিয়ে শুরু ; এবং ঐ ডিয়ার উচ্চারণের সময় প্রতিবারই সে বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে লিলির দিকে চায়— যার একটাই মাত্র অর্থ, এবং লিলি তা সহজে মেনে নিতে রাজী নয়। বিকেলে চিঠির তাড়া টাইপ করে যখন তার কাছে সই করতে নিয়ে যায়, সে তখন লিলির চোখে চোখ রেখে বলে ওঠে, 'আজ নাইট শো সিনেমা দেখতে যাবে ?' বলেই সহসা সে লিলির হাতখানি ধরে কাছে টানে, কোলের ওপর বসাতে চায় যেন। সেই মুহূর্তে লিলি ম্যানেজারের গালে চড় কষিয়ে দিয়ে, হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে।

ম্যানেজারের ঘর শীততাপনিয়ন্ত্রিত ; চড়ের শব্দ কেউ আর শুনতে পায় না। কিন্তু লিলি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সকলেই দেখে, তার চেহারা টকটকে লাল, দাঁতে কামড়ানো ওষ্ঠ, চোখে অশ্রু ছলো-ছলো। লিলি দ্রুত পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়, ড্রয়ার থেকে টুকি-টাকি জিনিস বার করে ব্যাগের ভেতর রাখে। সে জানে, এরপর অফিসে তাকে আর পা রাখতে হবে না।

অফিসের অন্যান্য কমবয়সী কেরানী, তারাও একসময় একে-একে লিলির সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু লিলি তাদের পাত্তা দেয়নি। সে কারো সঙ্গে সিনেমায় যায়নি, বা রেঁস্তোরায় চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেনি। একজন তাকে ঘন-ঘন অনুরোধ করায় সে তাকে বলেছিল—আই অ্যাম সরি। বিকেলে আজ মোহনের সঙ্গে অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট আছে।

'মোহন ?' মিহি ছুঁচলো গোঁফ কাঁপিয়ে টমাস ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করে, 'মোহন আবার কে ?'

লিলি জবাব দেয়, 'সে আমার মোহন !'

'তোমাদের কি এনগেজমেণ্ট হয়ে গেছে ?'

'বলতে পারো তাই।' লিলি জবাব দেয়।

'কবে ?'

'বছর বারো আগে।'

'তবে কি তোমার পাকা কথা কম বয়সে হয়েছে ?'

'ধরে নাও তাই।'

'মোহন হিন্দু নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কি করে ?'

লিলি স্মিত হেসে বলেছিল, 'ক্ষমা করবেন, জানা ছিল না ভালবাসার

কোন ধর্ম থাকে। বলেই সে ব্যাগ দোলাতে-দোলাতে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

লিলি চলে যেতেই ছুঁচলো দাড়িঅলা, লেজার ক্লার্ক আকবর আলি রেজিষ্টার বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল—উরে বাব্বা, এ যে দেখছি একেবারে লায়লা।

টমাস জানতে চায়, 'লায়লা, হু ইজ শী? আকবর আলি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, শী ওয়াজ ভালবাসার প্রেমিকা, লিলির মতোই।'

* * *

লোকাল ট্রেন প্যারেল স্টেশনে পৌঁছয়। ভিড় ঠেলে থার্ড ক্লাস থেকে লিলি কোনরকমে বেরিয়ে আসে, মোহনকে সে বড়ঘড়ির তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

মোহন এখন কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক। সে এখন মিলের মেকানিক। তার নীল শার্ট-প্যাণ্টে জানান দেয়, সে সোজা কাজ থেকে ফিরেছে।

'ডার্লিং', মোহনের হাতে হাত রেখে লিলি বলে, তোমায় কি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে?'

মোহন মৃদু হেসে বলে, 'মাত্র আধ ঘণ্টা—অবিশ্যি চারটে ট্রেন এরিমধ্যে পাশ করেছে। ব্যাপার কি শুনি, অফিসে কি খুব কাজ পড়েছে, নাকি ম্যানেজারের সঙ্গে ফ্লার্ট করছিলে?'

লিলি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—শয়তানটার নাম আর নিও না। ওর মুখ খামচে দিতে ইচ্ছে করে—তোমায় আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

ট্রেন চলে গেছে, প্লাটফর্ম ফাঁকা, নিস্তব্ধ। টি-স্টলের ধারে তাদের পুরনো চেনা বেঞ্চের ওপর বসে লিলি ও মোহন তেলেভাজা খায়। অকারণেই তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে ওঠে। তেলেভাজা যে শেষ হয়ে গেছে, সে খেয়ালটুকুও নেই—তারা পরস্পরের চোখে লীন। পরবর্তী ট্রেন আসে, প্যাসেঞ্জাররা একে একে কামরা থেকে ওঠা-নামা করে, ট্রেন চলে যায়। আবার স্টেশনে নিস্তব্ধতা।

রাত ক্রমশঃ নামে। স্টেশনের বাতি জ্বলে ওঠে। ট্রেন আসে, যায়—প্যাসেঞ্জাররা ওঠানামা করে। লিলি ও মোহন সেই একই জায়গায় বসে থাকে, তেলেভাজা কিনে খায়, অনবরত পরস্পরের চোখ লজ্জামধুর হয়ে ওঠে।

লিলি একসময় বলে ওঠে—রাত হয়েছে, এবার আমি আসি।

মোহন যেন স্বপ্নের ঘোরে—'লিলি, কিছু বললে?'

'না, কিছু বলিনি তো।' লিলির গলায় প্রত্যয় সুর, আবার তারা দুজনে

ডুবে যায় পরস্পরের মাঝে।

পরপর দুটো ট্রেন দক্ষিণে, তিনটে উত্তরে যায়-আসে। তারা দুজনে সে জায়গা ছেড়ে এতটুকু নড়ে না। চা-তেলেভাজার দোকান বন্ধ করার সময় হয়, ঝাঁপ ফেলার আগে চা-অলা বলে; লাস্ট ট্রেন আসছে। তারপর রাতে আর ট্রেন নেই।'

এবার তারা দুজনে সচকিত হয়। দূরে, ট্রেনের শব্দ ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে।

'কাল তাহলে তুমি আর অফিসে যাচ্ছ না?' মোহন জিজ্ঞেস করে।

'না, আমি আর অফিস যাচ্ছি না।'

'তাহলে তোমার দেখা পাবো কখন?'

'তোমার কাজের শিফ্‌ট শেষ হবার আগেই আমি এসে পড়বো।'

'তোমার ড্যাডি যদি বেরোতে না দেন?'

'তাহলে আসবো কি করে? তুমি বলো, কি করি?'

'একটা উপায় অবশ্য আছে, কাল আমরা বিয়ে করে নিই কেমন?'

লিলির কানে যেন রুপোর ছোট-ছোট ঝিনুক বেজে ওঠে। ট্রেন প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়। লিলি মৃদুস্বরে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কিছু বলে, কিন্তু ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দে তা হারিয়ে যায়।

লিলির হাত ধরে মোহন বলে, 'তোমায় বাড়ীতে পৌঁছে দিই।' তারা দুজনেই সামনের দিকে ফাঁকা জায়গা পেয়ে বসে পড়ে।

*　　　*　　　*

রাতের নিশুতিতে বান্দ্রার রাস্তা এখন শূন্যে। শুধু লিলি আর মোহনের পায়ের শব্দ, ফুটপাথে শুয়ে থাকা ইতস্ততঃ লোকেদের নাক ডাকার শব্দ। দূরে ঘড়ি পেটার শব্দ ভেসে আসে—দুটো।

মোহন বলে, 'লিলি, মনে পড়ে মাহিমের সেই বস্তির কথা—যেদিন আমাদের প্রথম আলাপ হয়েছিল—তখন রাত দুটো।

'হুঁ, স্পষ্ট মনে আছে, তুমি লুকিয়ে তোমার ঘড়া লাইনে রাখছিলে।'

'তুমি তখন লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছিলে। আধো-আধো গলায় বলেছিলে, মেরে একেবালে হাড়গোড় ভেঙ্গে দেবো।'

'জানো, মাহিমের বস্তির কথা আমার প্রায় মনে পড়ে। কি আনন্দেই না দিন কেটেছে।'

'এখন তোমরা কত ভাল ফ্লাটে থাকো।'

'ভালো বটে! তবে, তোমরাও সেখানে নেই। মাহিমের বস্তিতে আমরা রাতদিন একসঙ্গে খেলতুম।'

'মনে পড়ে, ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর ফাদার উইলিয়ামের দাড়ি এঁকেছিলুম?'

রাস্তার আলোয় লিলি হাতের চেটো মেলে ধরে, আজও অস্পষ্ট দুটো নীলচে দাগ সেখানে। বলে—হ্যাঁ, মনে আছে।

লিলির বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। দোতলায় লিলিদের ফ্লাটের জানালা বেয়ে আলো এসে পড়েছে।

মোহন বলে, 'তোমার ড্যাডি-মাম্মী সম্ভবতঃ জেগে আছেন। বকুনি দেবেন না তো ?'

লিলি বলে, 'কিছু ভেবো না, ওটা আমার ঘর। ল্যাচ-কী আমার কাছেই আছে। কালই আমি ড্যাডির সঙ্গে কথা বলে বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।'

অন্ধকারে আন্দাজে রাস্তা হাতড়ে-হাতড়ে লিলি ওপরে ওঠে। তার পায়ের শব্দ যতক্ষণ শোনা যায়, মোহন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ল্যাচ-কী দিয়ে দরজা খুলে লিলি তার ঘরে ঢোকে। বাইরের দিকে জানালা খুলে, 'সত্যি, মোহন কত ভালো।', সে ভাবে, 'আমার জন্য এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।' তারপর নিঃশব্দে হাত নাড়িয়ে মোহনকে বিদায় জানায়। নিশ্চিন্ত মনে মোহনকে এগিয়ে যেতে দেখে, সে জানালা থেকে সরে আসে।

পেছন ফিরতেই, মুখ থেকে মৃদু আর্তস্বর বেরিয়ে আসে।

ড্রেসিং গাউন গায়ে তার বাবা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

*   *   *

প্যারেল স্টেশনে এরিমধ্যে কয়েকটা লোকাল ট্রেন আসে, ঘর্ঘর শব্দ তুলে প্লাটফর্ম কাঁপিয়ে আবার চলে যায়। স্টেশনের চত্বরে সেই পুরনো, চেনা বেঞ্চের ওপর লিলি ও মোহন বসে। তাদের সামনে কাগজের ওপর রাখা মুড়ি ও তেলেভাজা। কিন্তু, আজ দুজনের কারো হাত সেই মুড়ি-তেলেভাজা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে না।

'তোমার ড্যাডি তাহলে রাজী হলেন না।' নৈঃশব্দ ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ঠেলে মোহন বলে ওঠে।

'শুধু গররাজী নয়,' লিলি বলে, 'এ ছাড়াও অনেক কিছু বলেছে—মদ খেয়েছিল, আমায় প্রচুর গালাগাল করলো, তোমায়ও বাদ রাখেনি।'

'কি বললেন ? একটু জানতে ইচ্ছে করে, আমার ভেতর কি এমন খুঁজে পেলেন তিনি ?'

লিলি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, কথাগুলি বলতে বিব্রত বোধ করে। এরিমধ্যে একটা ট্রেন এসে দাঁড়ায়, ভিড়ে একেবারে ঠাসা। প্যাসেঞ্জার—ওঠা-নামা করে, তবুও কামরাগুলো আগের মতই ঠাসা থাকে। ট্রেন চলে যায়। যারা নাবে, তারা সিঁড়ি ভেঙ্গে ওভারব্রীজ পার হয়ে গন্তব্য পথে চলে যায়।

প্ল্যাটফর্ম আবার আগের মত ফাঁকা।

লিলি ধীর গলায় বলে, 'জানো, ড্যাডি বলছিল তুমি…তুমি নাকি হিন্দু …বলছিল, মরে গেলেও হিন্দুর সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবো না।'

'তোমার ড্যাডি কি ক্রিশ্চান?'

'হ্যাঁ!'

'চার্চে যান?'

'আগে মাঝে-মাঝে রোববারে যেতেন, এখন মদ খেয়ে ফুরসতই পায়না, চার্চে যাবার কথা কখন ভাববে!'

'ফুরসত পেলে কি করেন?'

'তুমি তো সবই জানো মোহন, তোমায় সব খুলেই বলেছি।' লিলি গলা খাদে নামিয়ে ইতস্ততঃ চেয়ে বলে—ড্যাডি, চোলাই মদের ব্যাবসা করে।'

আরেকটা ট্রেন এরিমধ্যে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ায়, তেমন ভিড় নয়। থার্ড ক্লাস থেকে জনা পনরো-কুড়ি প্যাসেঞ্জার নাবে, ফার্স্টক্লাস থেকে একটিও নয় —ট্রেন এগিয়ে যায়, প্লাটফর্ম আবার ফাঁকা।

'আর কি কি বললেন তোমার ড্যাডি?' প্রতিটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে বলে মোহন।

কি হবে সে-সব কথা শুনে? তোমার সম্পর্কে এমন সব কথা বললো, যা আওড়াতে আমার মোটেই ভাল লাগবে না।

'তবুও, শুনি, আমার প্রতি তার কেমন ধারণা—এটা জানতে চাই। ধর্মের ব্যাপার ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাঁর আপত্তি আছে?'

'হ্যাঁ', লিলি বলে।

'কি?'

'বলছিল, তুমি একটা লেবারার, মিলশ্রমিক, তোমার গায়ে-কাপড়ে ঘাস আর তেলের দাগ—দুর্গন্ধ বেরোয়।'

'ওহ্, তিনি কি তাহলে সেসব দিনের কথা ভুলে গেছেন—যখন আমরা দুই পরিবারই মাহিমের বস্তিতে থাকতাম!'

'ঐ বস্তির কথা এখন আর মোটেই শুনতে চায় না। ঐ সব কুঁড়েঘর ঝুপড়ির কথা ভুলে যেতে চায়। সে আমার বাবা, তার সঙ্গে তর্ক করা শোভা পায় না। তুমিই বলো—তোমার বাবা কি বললেন? তিনি আমায় আশীর্বাদ করবেন তো?'

মোহন উত্তর দিতে যায়, এমন সময় একটা ট্রেন এসে থামে—ভিড়ে গাদাগাদি। যারা ভেতরে, তারা বাইরে বেরোবার জন্য চেষ্টা করে, আর যারা বাইরে, তারা হুটোপাটি করে ভেতরে ঢোকার জন্য চাপ দেয়। ফলে ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় ট্রেন ছেড়ে দেয়, কিছু প্যাসেঞ্জার নাবার

চেণ্টা করে, নাবতে না পেরে ভেতরে রয়ে যায়। যারা উঠতে পারে না, তারা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে একজন মাঝবয়েসী লোক—ময়লা পাজামা, ধুলোমাখা শার্ট পরনে—এসে সেই বেঞ্চে তাদের পাশ ঘেঁষে বসে।

তারপর, লিলি ও মোহনের দিকে অবাক বিস্ময় চোখে এমন ভাবে লক্ষ্য করে, যেন এর আগে এমন বিচিত্র যুগল সে জীবনে দেখেনি।

আড়চোখে লোকটাকে দেখে, মোহন ফিস্ ফিস্ করে বলে—'লোকটা এমন পিট্‌পিট্ করে কি দেখছে বলতো? বাবার জানাশোনা নয়তো?'

'তোমার বাবা কি বললেন?' লিলি আবার সেই প্রশ্ন আওড়ায়।

মোহন এতক্ষণ এ প্রশ্নে আশঙ্কিত; অবশেষে তাকে উত্তর দিতে হয়—সে—মানে—বাবাও এ বিয়ের বিরুদ্ধে লিলি!'

'কারণ?'

'বললো, হিন্দু হয়ে ক্রিশ্চান মেয়ে বিয়ে করবি?'

'কেন? ক্রিশ্চান মেয়ের কি এমন খারাপটা দেখলেন?'

'বললো, ক্রিশ্চান মেয়েরা ভালো হয় না, ওরা সব পুরুষের সঙ্গে খুব মেলামেশা করে।'

লিলির শ্যামবর্ণ গালে বেগুনী ছড়িয়ে পড়ে, 'তুমিও তাই মনে করো নাকি?'

'না-না-লিলি, কি যে বলো! ঠিক তা নয়। আমি কি তা মনে করতে পারি? কিন্তু, বাবাকে কি করে বোঝাই বলতো! তোমার ড্যাডিকেও গালমন্দ করলো। মদ-টদের ব্যবসা করেন!

'হুঁ, তোমার বাবা কিসের ব্যবসা করেন?'

মোহন কিছুটা অস্বস্তি; কিছুটা বিব্রত গলায় বলে—'সাট্টার।'

লিলি কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এরিমধ্যে আরেকটা ট্রেন এসে থামে। প্লাটফর্মে আবার সেই ভিড়, কোলাহল। বেঞ্চের আধবুড়ো লোকটা চুপচাপ একধারে বসে তাদের লক্ষ্য করে, আর মাঝে-মাঝে মুখ টিপে হাসে।

ট্রেন চলে যেতেই লিলি বলে ওঠে—'তারপর?'

'ভেবে কিছু ঠিক করে উঠতে পারছি না। জানো, এই দুশ্চিন্তায় আজ আমি 'মিলে' যেতে পারিনি। তোমার ড্যাডি যদি অন্য কারো সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়, সত্যি বলছি, আমি তাহলে প্রাণ দেবো।'

লিলি বলে, 'তুমি বুঝি ভেবেছো আমি বেঁচে থাকবো? ড্যাডি যদি জোরজার করে, আমি তাহলে বিষ খাবো। মোহন, আমায় একটু বিষ জোগাড় করে দিতে পারো?'

'বিষ পাবো কোত্থেকে? আজকাল বিষের ওপর কণ্ট্রোল! ডাক্তারের

প্রেসক্রিপশান ছাড়া বিষ পাওয়া যায় না।'

কিছুটা সময় দুজনেই নীরব, তেলেভাজা পড়ে থাকে তাদের মাঝখানে। তারপর সহসা তাদের—প্রথমে লিলির, পরে মোহনের—দৃষ্টি রেললাইনের ওপর পড়ে—দিগন্তবিস্তৃত কালো একজোড়া সমান্তরাল রেললাইন, চাকার ঘর্ষণে চিরিক্-চিরিক্ আলো ছড়িয়ে পড়ে। দূরে ট্রেনের আভাষ। লাইনে এক ধরনের গম্গম্ শব্দ ভেসে ওঠে, যেন কেউ সেতার বাজাচ্ছে, তারই ঝংকার মাতিয়ে তুলেছে। কিংবা, বহুসংখ্যক ভ্রমর গুণগুণ করছে। লাইন বেয়ে ওঠা বিচিত্র শব্দ তাদের মনে কিছু একটা ইঙ্গিত বহন করে।

তাদের দুজনের দৃষ্টি রেললাইনে আঁটা, এরিমধ্যে ঘর্ঘর শব্দ তুলে একটা ট্রেন এসে থামে। মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে, তাদের সামনেই লাইনের ওপর ভারি ভয়ংকর চাকাগুলি ঘর্ঘর শব্দ তুলে চলে যায়। লাইনের ওপর আগের মত আলো ছিটকে পড়ে, গমগম শব্দে যেন তাদের কিছু বলে যায়।

সহসা, তারা দুজনেই একযোগে যেন বুঝতে পারে, রেললাইন কি বলছে!

লিলি মোহনের দিকে চায়।

মোহন লিলির দিকে।

দুজনের চোখে একই প্রশ্ন—একই উত্তর—জীবন থেকে মৃত্যু অনেক শ্রেয় —ঐ রেললাইন ক্রমাগত তাদের হাতছানি দিতে থাকে—প্রতীক্ষা করছে তাদের জন্য।

ক্রমে অগ্রসারিত ট্রেনের ঘর্ঘর শব্দে রেললাইন কেঁপে-কেঁপে ওঠে। তারা দুজনে উঠে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ তারা দুজনে চোখে-চোখ রেখে নীরবে ভালবাসার শপথ নেয়—লিলির নরম কোমল হাত মোহনের শক্ত ও বলিষ্ঠ পৌরুষ-হাতে এসে ধরা দেয়।

ঘর্ঘর শব্দ তুলে ট্রেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসে।

আর কিছুক্ষণ মাত্র! তারপর, তারা দুজনে রেললাইনে ঝাঁপ দেবে, ট্রেনের ভারি চাকা তাদের যাবতীয় যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটাবে, মৃত্যুর কোলে চিরদিনের জন্য শুইয়ে রাখবে পাশাপাশি! তাদের ভালবাসা, তাদের প্রেম—অমর করে দেবে।

'এ-ই!'

ডাকটা তাদের দুজনকেই একসঙ্গে চমকে দেয়। সেই মুহূর্তে ট্রেন এসে পড়ে, কামরাগুলি তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যায়। লিলি ও মোহন ফিরে তাকায়। সেই আধময়লা পাজামা, ছেঁড়া শার্ট পরণে, আধবুড়ো লোকটা হাসি-হাসি মুখে তেলেভাজার ঠোঙার দিকে ইশারা করে।

'তোমাদের তেলেভাজা নিয়ে যাও।' সে চেঁচিয়ে ওঠে।

তেলেভাজা। আহা, মুচমুচে ঝাল-তেলেভাজা! তেলেভাজার নাম শুনে তাদের মুখে জল ভরে আসে।

তেলেভাজা। মুচমুচে ঝাল-মসালা দেয়া তেলেভাজা।

হুঁ, যদি তারা মরে যায়, তেলেভাজা খাবে কি করে? কি করেই বা খাবে ঠাণ্ডা মিঠে ফালুদা? জ্যোৎস্না রাতে, জুহুর নরম-ভেজা বালুচরের সুখস্পর্শানুভূতি কি করেই বা গালে অনুভব করবে? মালাবার হিলে হ্যাংগিং গার্ডেনের পুষ্প প্রদর্শনীর সৌন্দর্যই বা উপভোগ করবে কি করে? তেলেভাজা নয়—যেন জীবন; তার সমস্ত আকর্ষণ ঐ মুচমুচে মশালা দেয়া সৌরভ নিয়ে ক্রমাগত তাদের পেছন ডাকে।

লিলির কানে-কানে মোহন চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'চলো, সিভিল ম্যারেজ করে ফেলি। এক্ষুনি। রাজী আছো?

মোহনের কানে-কানেও ঠিক সেই স্বরে লিলি জবাব দেয়, 'হ্যাঁ! রাজী।'

'তাহলে, চলো চার্চগেটে যাই।' মোহন লিলির হাত ধরে, ভিড়ে ঠাসা কামরায় তারা ঢোকে। তারপর, কোনরকমে ভেতরে জায়গা করে নেয়।

ট্রেন ছাড়ে।

কিন্তু, সেই আধবুড়ো লোকটা ঠায় বেঞ্চের ওপর বসে থাকে। তেলেভাজাও পড়ে থাকে তেমনি। তারপর, লোকটা ধীরে-সুস্থে সেই জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে গিয়ে তেলেভাজার ঠোঙা তুলে আপন মনে খেতে শুরু করে। দোকান থেকে চা-অলা চেঁচিয়ে ওঠে—'ওরা চলে গেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ!'

'ওরা রোজ আমার এখানে তেলেভাজা খায়।' চা-অলা বলে।

'জানি! তবে, এরপর থেকে তেলেভাজা খেতে আসবে না। ওরা যে এখন নিজেরাই মুচমুচে ঝাল মশালার তেলেভাজা করবে।'

'চেন নাকি ওদের? কে ওরা?'

তেলেভাজায় চাটনি মাখিয়ে বুড়োটা বেশ তাড়িয়ে-তাড়িয়ে খেতে থাকে। খেতে-খেতেই জবাব দেয়—'লায়লা-মজনু!'

একটি জ্বলন্ত স্টোভের কাহিনী

শান্তা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে প্রাইমাস স্টোভে পাম্প করছিল, মনে মনে ভাবছিল— গোটা বোম্বাই শহরে গ্যাসের সিলিণ্ডার ব্যবহৃত হয়, অথচ আমাদের বাড়িতে মান্ধাতা'আমলের এই ভয়ঙ্কর স্টোভ ব্যবহৃত হয়। কেন ?

তার স্বামী শেয়ার বাজারের দালাল। প্রতিমাসে হাজার-পনরো'শ টাকা ঘরে আনে। তারা এখনও দু-কামরার ফ্লাটে থাকে— যার আগেকার ভাড়া মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। ফ্লাটে দরকারী সব জিনিষ আছে, শুধু গ্যাসের উনুন নেই। ভালো দামী রেডিয়ো আছে, রোজ রাত্রে ছগনলাল মার্কেটের খবর গভীর মনোযোগে শোনে। হাতে লালখেরোর খাতায় শেয়ার বাজারের ওঠা-নামা দর লেখে। ফ্রিজ আছে—কেননা ছগনলাল ও তাঁর মা'র সহ্য হতো না সামান্যতম অবশিষ্ট খাবার যেন ফেলা হয়। কিংবা, ভিখিরিকে বিলিয়ে দেয়। ষ্টিলের দুটো ভারি আলমারী আছে—একটায় সকলের পোষাক ইত্যাদি থাকে, অন্যটায় ছগনলাল তার হিসেবের খাতা-পত্র রাখে। এছাড়া দিশি হুইস্কীর বোতল রাখে—যা থেকে রোজ রাত্রে মেপে-মেপে দু-পেগ খায়… একাগ্র ও নিষ্ঠাভরে, যেন বা পুজো করে।

বিকেলে ফিরে এসে প্রথমে সে স্নান করে। তারপর, কাচা ধুতি পরে দেয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর পট প্রণাম করে। এসব করার পর সে হুইস্কীর বোতল, জলের বোতল আর গেলাস নিয়ে বসে। এরিমধ্যে তাঁর মা হনুমানজীর মন্দিরে পুজো সেরে ফেরেন। মার দেয়া প্রসাদ ছগনলাল হাত পেতে নেয়, হুইস্কীর চুমুকের সঙ্গে সেটাও গিলে ফেলে। তার ঘরে বেশ বড় সাইজের একটা ক্যাম্পখাট আছে, মদের পর রাতের খাবার খেয়ে সে ঐ ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ে। তার স্ত্রী শান্তা, ঐ ক্যাম্পখাটের তলায় মেজের ওপর বিছানা পেতে শোয়। শোবার আগে স্বামীর পা টিপে দেয়, এবং অধিকাংশ দিন পা-টেপার মাঝেই ছগনলালের নাক ডাকতে শুরু করে। প্রথম প্রথম প্রতি তিন দিন অন্তর, তারপর প্রতিমাসে ছগনলালের হাত নেমে এসে শান্তার কাঁধে নাড়া দিত। মিনিট কয়েকের জন্য, সে ক্যাম্পখাটে উঠে আসার অনুমতি পেত এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে ছগনলালের বাসনার ছাপ এঁকে দিত। তারপর, শান্তা ক্যাম্পখাট থেকে মেজেতে ফিরে আসত। চুপচাপ শুয়ে অন্ধকারে চেয়ে থাকত অনেকক্ষণ।

শান্তা ও ছগনলালের বিয়ে হয়েছে ছ'বছর। রাজকোট থেকে শান্তাকে বিয়ে করে এনেছে ছগনলাল। বিয়ের কথাবার্তা যখন স্থির হয়, শান্তার বাবা রাজকোটে বড় ব্যবসায়ী বলে পরিচিত ছিলেন। ছগনলাল তখন সবে দালালীর কাজ শুরু করেছিল বোম্বাইয়ে। মাসে বড়জোর দু-তিনশো টাকা

আয়। তার ও মার একান্ত আকাঙ্খা ছিল, শান্তার বাবা পণ হিসেবে বেশ কিছু টাকা দেবে, যার সাহায্যে ছগনলালের ব্যবসা ফেঁপে-ফুলে উঠবে। মা যখন বলে, বিয়ের আগে ভাবি-বউকে দেখে আয়; ছগনলাল হেসে বলেছিল —আমি আবার কি দেখবো মা। তুমি তো দেখেছো, তাই যথেষ্ট। কানা-নুলো না হলেই হলো, আর দেখো—খুব কালো যেন না হয়—লোকেরা বৌ দেখে যেন আমায় বিদ্রূপ না করে; আর কিছু দেখার দরকার নেই। তবে 'হ্যাঁ, পনের টাকা গুণে সামলে রেখো। কথাগুলি সে হেসে বলতো বটে, তবে সত্যি বলতে কি—শান্তা বিয়েতে কত নগদ আনবে,—এ ছাড়া স্ত্রী সম্পর্কে ছগনলালের বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না।

মালক্ষ্মী সম্ভবতঃ ছগনলাল ও শান্তার বাবার ওপর সদয় ছিলেন না। বিয়ের দিন কয়েক আগে—দেয়ালীর কিছু পরে—শান্তার বাবা হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে যান। পনের টাকা সে দিতে পারেন না। ছগনলালের মাকে কথা দেয়া ছিল। বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি বিলি হয়ে গেছিল। তা সত্ত্বেও মা ছেলেকে ডেকে বলেছিল—তুই যদি বলিস ছগন, এখনও বারণ করে দিই। কিন্তু, কি জানি কি ভেবে ছগনলাল বলে—থাকতে দাও মা। ভাগ্যে যা লেখা আছে—হবেই। এখন কোথায় আর খুঁজে পাবে! তারপর কি ভেবে আবার বলে—থাক্, তোমার আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না।

বিয়ের রাতে ছগনলাল বৌকে দেখে, না, পরী বা কোন ফিল্মস্টারের মত সুন্দরী নয়, তবে বিয়ের লাল জোড়ে তাকে বেশ রূপসীই মনে হয়। ছগনলাল সহজে স্বামী হওয়ার অধিকার স্বীকার করে নেয়, যাক্ ভালই হলো, স্বাস্থ্যের জন্য আর বাইরে মুখ কালো করার দরকার নেই।

এ্যাই কথা বলছো না কেন? কিছু একটা বলো। একরাতে শান্তা সাহসে বলেই ফেলে—আমার চুপচাপ ভালোলাগে না।

ই স্ স্ স্! ছগনলাল তাকে চুপ করে থাকতে বলে—তোমার কি লজ্জা ভয় নেই। মা ঐ সামনের ঘরে শুয়ে আছে!

শান্তার মনের পৃথিবী নির্জন-সুনসান হয়ে পড়ে।

তারপর থেকে শান্তা ও ছগনলালের মাঝে এমন এক ধরনের কালো নীরবতা ছেয়ে থাকে, যাতে কোন নক্ষত্র ঝিকিমিকি করে না।

তৃতীয় দিবস থেকে প্রতি সপ্তাহে, প্রতি সপ্তাহ থেকে প্রতি মাসে শান্তাকে ক্যাম্পখাটে উঠে আসার নিমন্ত্রণ জানাতো। স্বামীর তৃষ্ণা মিটিয়ে, নিজে তৃষ্ণার্ত হয়ে খাট থেকে ফিরে আসতো, তারপর অন্ধকার ঘণ্টা-আধঘণ্টা তাকিয়ে থাকতো স্রেফ।

শান্তার বিয়ের মাস কয়েক পরে তার বাবার মৃত্যু হয়, মা আগেই গত হয়েছিল, ফলে সেই যে বোম্বাই আসে, আর রাজকোটে যাবার কোন প্রশ্নই

ওঠেনি। দূর সম্পর্কের মামা-মাসীদের মাঝে-সাঝে চিঠি আসত। কিন্তু ছগনলাল ও তার মা কুড়ি পয়সা ডাকটিকিটের খরচ করাটাও ব্যয় মনে করত, ফলে শান্তা তাঁদের উত্তর দেয়া বন্ধ করে দেয়। দিন কয়েকের মধ্যে খোঁজ-খবর নেয়াও বন্ধ হয়ে যায়। এখন তার গোটা জীবন এই দু-কামরার চৌহদ্দিতে বাঁধা। তবুও সে নিজের জীবন সম্পর্কে অসুখী ছিল না। তার ধারণা, সব বিবাহিত মেয়েদের জীবন এ রকমই কাটে। সকালে ওঠে। ঝাঁট দেয়। ঘর মোছে। উনুন ধরায়। চা করে স্বামীকে দেয়। তারপর রান্না করে। স্বামীকে ভাত বেড়ে দেয়। তারপর শাশুড়িকে বেড়ে দেয়। স্বামী কাজে বেরিয়ে গেলে কাপড়-চোপর ধোয়। শাশুড়ির পা টিপে দেয়। দুপুরে ঘণ্টা দুয়েক শুয়ে কাটায়, কিংবা পাশের ফ্ল্যাটের কারো সঙ্গে গল্প-গুজব করে। রাত্রে আবার সেই উনুন—হাতাবেড়ি।

শান্তা মনে মনে ভাবে, ভাগ্যিস, এখন আর যাঁতা ঘুরিয়ে গম-যব ভাঙতে হয় না। ইলেক্ট্রিক মেশিনে ভাঙা আটা পাওয়া যায়। অবশ্য চাল-ডাল বাছতে হয়, কাঁকর পাথরের জন্য। রইলো উনুন, এখন ঘরে-ঘরে গ্যাসের উনুন। কেন যে আমাদের বাড়ীতে কেরোসিনের স্টোভ জ্বলে, ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ পরে-পরে সাইকেলের চাকার মত পাম্প ভরতে হয়। কেন জানি না, কারো উপস্থিতিতে এভাবে ঠেলে ভেতরে-বাইরে পাম্প করতে শান্তার ভয়ানক লজ্জা করে; এমন এক ভঙ্গিমার কাজ—যা শুধু রাতের অন্ধকারেই করা চলে।

*　　　*　　　*

শাশুড়ি বা স্বামীর প্রতি শান্তার কোন অভিযোগ ছিল না। যদিও শাশুড়ি তার কাছ থেকে দিন রাত কাজ আদায় করতো, কড়া নজর রাখতো যাতে সে আর কারো সঙ্গে হাসে বা কথা বলে না। শান্তা বাজারে গেলে, কতক্ষণে ফিরে আসে তা লক্ষ্য রাখে। এসব কাজ তো শাশুড়ির অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। বরং সে নিজেকে ভাগ্যশালী মনে করে, শাশুড়ি বা স্বামী তাকে কখনও মারধোর করে না—আশেপাশে অনেক বউ মারধোর খায়। ছগনলাল ওর সঙ্গে উঁচু গলায় কখনও কথা বলে না। সত্যি বলতে কি, ওর সঙ্গে সাধারণ কথাও সরাসরি বলে না, সবসময় মা'র মারফৎ স্ত্রীকে আদেশ দেয়—মা, ওকে বলো, আমার শার্ট আর ধুতি যেন কেচে রাখে···মা, ওকে বলো, আজ তরকারিতে নুন একটু বেশী পড়েছে···মা, ওকে বলো, খাটের চাদর আর পাশবালিশের ওয়াড় আজ যেন পালটে দেয়। শেষ আদেশ শুনে শান্তা মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠতো, কেননা যেদিন চাদর ও ওয়াড় পাল্টানো হতো, সে রাতে ক্যাম্পখাট থেকে নিঃশব্দ আমন্ত্রণ অবধারিত ভাবেই আসতো।

শান্তা প্রায়শঃ ভাবতো, আমার স্বামী-শাশুড়ি কতই না ভালো। বিয়ের ছ বছর পার হয়ে গেলেও আমাদের একটাও সন্তান হয়নি, তবুও এঁরা কখনও আমাকে দোষারোপ করে নি। অন্যান্য প্রতিবেশীদের ঘরে বউয়ের মেয়ে হলে, তাকে দোষী ঠাওড়ায়। ছেলে জন্ম দিলেই বউ অধিকার পায় ঘরে। সন্তান-হীনতার খোঁটা শান্তাকে কখনও দেয়নি ছগনলাল, তার মা-ও দেয় নি। বরং সে সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রম-মঠে গিয়েছে, ওষুধ, ইঞ্জেকশান, যন্ত্রমন্ত্র, তাগাতাবিজ মাদুলী সব কিছু ধারণ করেছে। শাশুড়ি তার ছেলেকে বৌমার উপস্থিতিতে বড় জোর এ কথা বলেছে—অভাগীর ভাগ্যে কোন ছেলেপিলে নেই।

এরপর শান্তা লক্ষ্য করে, প্রায় মা ও ছেলেতে ফিসফিস করে। তাদের কথার মাঝে, যদি সে কখনও এসে পড়ে, শাশুড়ি ভর্ৎসনা করে ওঠে—তুমি এদিকে কি করছো? যাও, নিজের কাজ করো গে! উনুন এমনি রেখে আসবে না—খাঁ খাঁ করছে। অসাবধানে আগুন ধরতে কতক্ষণ! শান্তা তখন রান্নাঘরে ফিরে এসে স্টোভে পাম্প করতে শুরু করে।

পাম্প করতে করতে সে আজ নিজের সৌভাগ্যের কথা মনে মনে ভাবছিল, কেননা আজই সে শাশুড়িকে এবং তাঁর মারফৎ স্বামীকে একটা নতুন খবর দেবে। যে খবরের জন্য তারা দুজনে ছ বছর ধরে প্রতীক্ষা করে আছে। সন্দেহ হচ্ছিল ক'দিন ধরে, আজ ব্যাপারটা একেবারে নিশ্চিন্ত করে দেয়। মিউনিসিপাল হাসপাতালে সে আজ বাজারের নাম করে গিয়েছিল, লেডি ডাক্তার পরীক্ষা করে তার শংকা বাস্তবে পরিবর্তিত করে দেয়। আর কিছুক্ষণ পরে, কয়েক মিনিট পরে সে এই সংবাদ ছগনলালের মা-কে জানিয়ে দেবে। শাশুড়ি খুশীর আতিশয্যে বৌমাকে জড়িয়ে ধরবে। তারপর ছেলেকে অভিনন্দন। হ্যাঁ, শান্তার জীবন একেবারে পাল্টে যাবে। মাস-কয়েক বাদে যখন ওর ছেলে হবে—ওর ধারণা তাই—তখন সে বাড়ীর রাণী হয়ে উঠবে। রাণী। এই ভেবে সে আরো জোরে পাম্প করতে থাকে।

* * *

পাম্প করতে করতে শান্তা ভাবছিল, এ সবই আমার পুজো-অর্চনা এবং ছগনলালের মায়ের আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনেছে, তাই আমার কোলে নয়নের মণি দিচ্ছে। সত্যি, কি করে যে ঘটল, ভাবতে গিয়ে সে হেসে ফেলে।

বছরখানেক আগেকার কথা। ক্যাম্পখাট থেকে নীরব আমন্ত্রণ আসা কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। ছগনলাল ঐসময়ে নানাবিধ ঝামেলায় বিব্রত ছিল। হয়তো ব্যবসায় লোকসান চলছিল। বাড়ী ফিরে এসে হুইস্কী খেত, রাতের খাবার খেত, খবরের কাগজের পাতা নাড়াচাড়া করত, তারপর দেয়ালের-দিকে মুখ করে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ত। শান্তা সারারাত প্রতীক্ষায় কাটিয়ে

দিত, হয়তো ছগনের প্রয়োজন পড়বে। সবসময় মন চাইতো, স্বামী প্রয়োজন ছাড়া মাঝে-সাঝে যেন তাকে ডাকে। স্বামীর পদসেবা করবে, গায়ে-মাথায় তেল মেখে দেবে, জিজ্ঞেস করবে তাকে—কেন তুমি এত গম্ভীর থাকো? আমি ত আছি, বলো, কি সাহায্য করবো? আমার সঙ্গে কথা বলে মন হাল্কা করো। কিন্তু এমন কখনও হয় না। এমন কখনও হয়নি।

প্রাচীন ধ্যান-ধারনায় যুক্ত এক পরিবারে শান্তা পালিত হয়েছিল। কোন নাটক-নভেল সে পড়েনি, ধার্ম্মিক ছবি ছাড়া অন্য কোন সিনেমা সে দেখেনি। প্রেম যে কি বস্তু, তার জানা ছিল না। তবে এটা তার জানা ছিল, ছগনলাল অসুখী হলে সেও অসুখী হয়ে পড়ে। সুখী হলে, সেও সুখী। সে জানে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অদ্ভুত এক কোমল ধরনের সম্পর্ক থাকে, বিচিত্র এক টান থাকে—যা অটুট। অবশ্য এও সে জানে, অন্যান্য দেশে স্বামী-স্ত্রী এক অপরকে ত্যাগ করে। শুনেছে, ভারতেও নাকি কোন কোন স্থানে এমন হয়ে থাকে। কিন্তু তার কাছে এসব ব্যাপার খুবই গুরুত্বহীন, যেমন সে শুনেছিল দুজন আমেরিকান সাহেব চাঁদের মাটি ছুঁয়ে ফিরে এসেছে।

আবার এমন একটা সময় এলো, ছগনলাল যখন আইনের বইয়ের নেশায় ডুবে গেছিল। সব সময় মোটা মোটা ভারি বই পড়ছে। শান্তা ইংরেজী খুব কম জানে, তবুও এ বুঝতে তার অসুবিধে হয় না—এমন মোটা চামড়া বাঁধানো বই আইনেব বই না হয়ে যায় না। 'ল' কথাটা অবশ্য সে পড়তে পারে। তারপর একজন উকিলের যাতায়াত শুরু হয় বাড়ীতে। সেই টাক-মাথা উকিল যখনই আসতো, ছগনলাল তাকে চা তৈরী করতে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিত। বহুক্ষণ ধরে তারা ফিস্ ফিস্ করে আলোচনা করত। ইংরেজীতেই কথা বলত, হিন্দি বা গুজরাতীতে খুব কম কথাই বলত। একবার ডিভোর্স শব্দটা শান্তার কানে গিয়েছিল, কিন্তু তার বুদ্ধিতে কুলোয় নি—কিসের ডিভোর্স, কার ডিভোর্সের কথা বলছে। হয়তো উকিলের কাছে ঝামেলার মোকদ্দমা এসে হাজির হয়ে থাকবে।

একবার উকিলকে সে বলতে শোনে—খুবই অসুবিধের ব্যাপার ছগনলাল বাবু।

তার স্বামী বলেছিল—আপনি যদি তা না করতে পারেন, তাহলে উকিল হয়ে কার রোগ সারাবেন?

চা নিয়ে সে তখন সবে ঘরে ঢুকেছে, উকিল সাহেব কথা বলতে বলতে থেমে পড়ে—হবে না কেন, সময় লাগবে। তাছাড়া আপনার বেশ কিছু খরচ হবে···তারপর দুজনে গুজরাতীর বদলে আবার ইংরেজীতে কথা শুরু করে। চায়ের পেয়ালা সেখানে রেখে সে ফিরে আসে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় ছগনলাল উকিলকে বলে—বুঝতেই পারছেন, আমৃত্যু

আমার পিছু ছাড়বে না··· ! সে ভাবে, কার কাছ থেকে পিছু ছাড়ার কথা বলছে। চোরের মত একটা ভাবনা তার মনে জেগে ওঠে, সে কি আমার কথা বলছে? ছগনলাল কি ডিভোর্স করবে, তাকে ছেড়ে দেবে? প্রতিবেশীদের কাছে শান্তা শুনেছে, গভর্নমেণ্ট নাকি আইন করেছে, হিন্দু ধর্মের স্বামী-স্ত্রী এক অপরকে ডিভোর্স করতে পারে। ভাবে, গভর্নমেন্ট আইন করে বটে, কিন্তু সব আইন তো আর কার্যকর হয় না। অস্পৃশ্য সম্পর্কে আইন আছে, অথচ হরিজন ও অস্পৃশ্য একাকার হয়ে গেছে।

শান্তা ভাবে, ছগনলাল তাকে ডিভোর্স কেন করবে, কি কারণ হতে পারে? শান্তা তাকে, তার মাকে সেবা করে, রান্না-গেরস্থালীর কাজ করে, ঘর ধোয়া মোছা করে, কাপড় কাচে, কখনও সিনেমা যাবার আব্দার করে না, নতুন শাড়ি বা গয়নার জন্য জেদ করে না। সে জানে, যৌতুক ছাড়া যে মেয়ে বউ হয়ে আসে, তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। ভুলেও ছগনলাল ছাড়া তার মনে অন্য কোন পুরুষের কথা জাগে নি। স্বামীকে সে দেবতার মত জ্ঞান করে। স্বামী চাইলে সে অবলীলায় তার পা-ধোয়া জল খেত, তাকে পুজো করত। যখনই ক্যাম্পখাটে আমন্ত্রণ আসে, সে নীরবে তার কর্তব্য পালন করে—যদিও গঙ্গায় অবগাহনের পর সে প্রতিবার তৃষ্ণার্ত থেকে যেত। সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার!

তারপর তার মনে হয়, এতটা বছর ধরে নিঃসন্তান আছে। হয়তো এ কারণে ছগনলাল তাকে ত্যাগ করতে চায়। অবশ্য এ একটা কারণ! তাই বলে ডিভোর্স নেয়ার দরকার কি? যদি এক বৌয়ের সন্তানাদি না হয়, তাহলে আরেকটা বৌ ঘরে আনতে পারে। আজন্মকাল এ রকম হয়ে আসছে। অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের একটু গুমোর হয়, কিছুটা ন্যাকামিও। কিন্তু, এতো ভাগ্যের লিখন। ভাগ্য চক্র। জন্ম রাশিতে যা লেখা হয়েছে, তাই ফলবে। প্রথম পক্ষের স্ত্রী যদি মনে-প্রাণে সেবা করে, তাহলে স্বামী তার খরচও বহন করে। ভাত-কাপড় দিয়ে থাকে।

মা। সুযোগ পেয়ে সে বলে।

কি? ছগনলালের মা কিছুটা বিরক্ত স্বরেই বলে।

আমি বড় অভাগিনী, তাই না মা?

সে আর বলতে। পাঁচ-পাঁচটা বছর পার হয়ে গেল, একটা ছেলের জন্ম দিতে পারলে না।

তাই তো বলছি মা, উনি যদি আরেকটা বিয়ে করেন, তাহলে ভাল হয়···

ওমা, এ কি কথা! জানো না বুঝি, নতুন আইন পাশ হয়েছে। কোন হিন্দু একটা বৌ থাকলে আরেকটা বিয়ে করতে পারবে না। শেষে কি ওকে জেলে পাঠানোর মতলব?

কথা আর এগোয় না। কিন্তু শান্তার মনে ক্রমাগত ঘুরপাক খায়। গভর্নমেণ্টের এ বড় অন্যায়। আরেকটা বিয়ে করতে দেবে না কেন? সে যখন সতীনের ঘর করতে রাজী, গভর্নমেণ্ট তার ব্যাপারে নাক গলাবার কে? আচ্ছা, ডিভোর্স যদি করে, তাহলে ভাত-কাপড় জোগাবে কে? এমন জীবনের চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়। পরবর্তী কয়েকমাস ঘুমে-জাগরণে শান্তার অবচেতন মনে মৃত্যু চেপে থাকে···আমার মত হতভাগিনীর মৃত্যুও হয় না। আত্মহত্যার জন্য বিশাল হৃদয়ের প্রয়োজন। মৃত্যু যদি সরাসরি হাজির হয়, তার জন্য সে প্রস্তুত। বেচারা ছগনলাল অন্ততঃ এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে। পিতৃ-পিতামহর বংশ কি ভাবে রক্ষা করা যায়? কিভাবে সে বিয়ে করে?

বৃষ্টিপতনের ফলে বোম্বাই শহর কিছুটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। শান্তা বাইরে গাড়ীবারান্দায় সকাল-সন্ধ্যে বৃষ্টিতে ভেজে। মনে-মনে ভাবে, আহা, আমার যদি নিউমোনিয়া হয়। আমি সহজেই মরবো। অথচ, তার সামান্যতম হাঁচি-সর্দি হয় না।

তারপর, একরাতে যখন সে মেজের ওপর শুয়ে শুয়ে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে ভাবছিল, এমন সময় কাঁধে ছগনলালের হাত আলতো স্পর্শ করে। বেশ কয়েকমাস পরে ক্যাম্পখাটে আসার আমন্ত্রণ।

সে-রাত! সে-রাতের কথা সে কখনও কি ভুলতে পারে। সেই রাতেই ব্যাপারটা ঘটে, ছ'বছর ধরে যা হয়নি।

প্রথমে সে ছগনলালের কথা শুনে থমকে যায়—দয়া করে, পা টা টিপে দাও। আজ আমি বড় ক্লান্ত।

দয়া? সে তো নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে—এমন একটা সাধারণ সেবার জন্য স্বামী তাকে অনুরোধ করেছে। অন্ধকারেও সে নিজের গালের তপ্ততা টের পায়। পা টিপতে-টিপতে শান্তা বুঝতে পারে, ছগনলালের শরীর জেগে উঠেছে। আজ আর ইঙ্গিত নয়, সরাসরি আমন্ত্রণ জানায়—শান্তা, এসো, তুমিও পাশে শুয়ে পড়ো। সারাদিন খাটাখাটুনি গেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছো তাতে।

শান্তার মনে হয়, আজ রাতে বুঝি মনের সবকটা দরজা খুলে যাবে। সে ক্যাম্পখাটে উঠে শুয়ে পড়ে—কিছুটা সরে। ছগনলাল বলে—কাছে এসে শোও। এই বলে শান্তাকে বুকের মাঝে সাপটে ধরে।

হে ভগবান! শান্তার হৃদয় খুশীতে নেচে ওঠে। হৃদয়ের উথালি-পাথালিতে সহসা জিজ্ঞেস করে—আজ কি হলো তোমার?

ছ'বছর পর স্বামীর ভালবাসার স্বাদ পেয়ে তার ছোট্ট বুকখানি ধুকপুক করে। মনের ভাবনা কান্না হয়ে বেরিয়ে আসে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তার।

এ কি ? তুমি কাঁদছো ? ছগনলাল কোমল স্বরে জানতে চায়। আজ তার এও খেয়াল থাকে না, পাশের ঘরে মা রয়েছে। শুনতে পাবে। কি ভাববে !

শান্তা তার কানে-কানে বলে—এটা খুশীর কান্না। এই বলে সে অসহিষ্ণু ভাবে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে। তার হাত জোড়া ছগনলালের কণ্ঠ-হার হয়ে পড়ে। দুজোড়া ঠোঁট পরস্পরের স্পর্শে দুরন্ত হয়ে ওঠে। ঘটনা সেরকম, ইতিপূর্বে বহুবারই ঘটেছে—কিন্তু, আজ শান্তার শুষ্ক জীবনে বসন্তের ধারা নেমে আসে।

ওমা, আমার কি হলো। 'আমি যে মরে যাচ্ছি। আমি···আমি বেঁচে উঠেছি। তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুলেছো, ছগন···।

এ কি ! তার মুখ থেকে স্বামীর নাম বেরিয়ে আসে। ভাবতেই, সেই রোমাঞ্চময় মুহূর্তও থমকে পড়ে।

জানালা বেয়ে আসা নক্ষত্রের ধূসর আলোয় সে কিছুক্ষণ স্বামীকে পর্যবেক্ষণ করে। নিশ্চিন্তে, তৃপ্তিতে অগাধ ঘুমে সে তলিয়ে আছে। এই আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছে কার কাছ থেকে ? হ্যাঁ, তার স্ত্রীর কাছ থেকে সে পেয়েছে। আজ শান্তার শরীরও লজ্জায়, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ছিল। এত ক্লান্তি—ক্যাম্পখাট থেকে উঠতেও মন চাইছিল না। ভাবে, আরও কিছুক্ষণ সে আরাম করে নিক তারপর এক সময় নীচে বিছানায় গিয়ে শোবে। নিদ্রিত স্বামীর হাতের ওপর সে হাত রাখে। তারপর ঘুমের একটা ঢেউ এসে তাকে ডুবিয়ে দেয়, চোখ বুজে আসে তার।

*　　*　　*

সে-রাতের দিন দুই পরে, ছগনলাল ইংরেজীতে ছাপা একটা ফর্ম নিয়ে আসে। শান্তাকে বলে—তোমার একটা ইনস্যুরেন্স করাচ্ছি। পঞ্চাশ হাজার টাকার। নাও, এখানে সই করে দাও।

শান্তা গুজরাতীতে সই করে। ছগনলাল বলে ওঠে—আমিও একটা ইন-স্যুরেন্স করিয়েছি তোমার নামে। যদি আমার কিছু ঘটে, টাকাটা তুমি পাবে।

ঈশ্বর না করুক, তোমার কিছু ঘটে। শান্তা দ্রুত বলে ওঠে—কি যে বলো তুমি ! সতীনারীর মৃতদেহ পতির কাঁধে বয়েই যায়। এখন তারা দুজনে দিনে-দুপুরে কথা বলে, গল্প করে। শান্তা আবার বলে—আমার বীমা তোমার নামে করে নাও।

তাহলে এখানে সই করো। ছগনলাল হাসতে-হাসতে বলে—এই পলিসিটার মজা কি জানো, তোমায় মরতে হবে না, অথচ কুড়ি বছর বাদে সুদ শুদ্ধ সব টাকা আমাদের জীবদ্দশায় পাওয়া যাবে। বুঝলে ?

শান্তা বলতে চাইছিলো, তখন ঐ টাকা আমাদের ছেলের বিয়ের সময় কাজে লাগবে। পাড়া-প্রতিবেশী ঝি-বউরা ওর সঙ্গে রসিকতা করে, স্বামী-

দেবতাটিকে খুব খেয়াল রাখে। একজন বলেই ফেলে—মাগো, তোমরা এমন করছো যেন দিন সাতেক হলো তোমাদের বিয়ে হয়েছে।

তাই তো! শান্তা বিচিত্র হাসিতে গলে পড়ে—হ্যাঁ গো, গত সপ্তাহেই বিয়ে হয়েছে।

সে মাসে একদিন পার হওয়ায়, শান্তার মনে আশ্বাসের হাল্কা ধরনের আলো দেখা দেয়। দু-দিন পার হয়, মন তার খুশীতে দুরু দুরু করে কাঁপে। তিনদিন পার হলে, মনে-মনেই গুণগুণ করতে শুরু করে।

তবুও কাউকে কিছু বলতে ত্যর সাহস হয় না। চতুর্থ দিনে শিব-চতুর্থী ব্রত। হাতে মেঁহেদি মাখে, আপন সংসারের মঙ্গল কামনায়। স্বামীর কল্যাণ কামনায ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। আজ রাতে চাঁদ দেখে ব্রত ভাঙ্গবে সে, তারপব স্বামীর চাঁদমুখ দেখবে। যদি আজ তাকে এই শুভ-সংবাদটি দিতে পারে·····আহা, সে আব স্থির থাকতে পাবে না। স্বামী কাজে বেরিযে গেলে, বাজাবে যাবার অজুহাতে সে মিউনিসিপাল হাসপাতালে যায়। লেডি ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে—শিব-চতুর্থী ব্রতে এই সুসংবাদ নিয়ে বাড়ী যাচ্ছো, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার সময় শাশুড়ির সঙ্গে দেখা। তিনি বেরোচ্ছিলেন—আমি মন্দিরে যাচ্ছি বৌমা! রান্না করে রেখো। শোনো, ছগন তোমার জন্য নতুন শাড়ি এনে রেখেছে। আজ তুমি শিব-চতুর্থী ব্রত পালন করছো, ও শুনেছে। ওর ইচ্ছে, তুমি আজ নতুন শাড়ি পরো। বুঝলে।

এই বলে শ্বাশুড়ি মন্দিরে রওনা হয়ে পড়ে। শান্তা দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে ঘরে ঢোকে। দরজা খুলেই দেখতে পায, শাড়ির একটা প্যাকেট রাখা আছে। তাড়াতাড়ি খুলতেই, ভেতর থেকে সুন্দর একটা শাড়ি বেরিয়ে পড়ে। এমন সুন্দর শাড়ি সে অদ্যাবধি পরেনি। কি নরম মোলায়েম, একেবারে তুলোর মত। শাড়ির ভাঁজ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সে ভাবে, বেশ দামি শাড়ি···নায়লন শাড়ি।

হ্যাঁ, আজকের দিনই শাড়ি পরার দিন। সে ভাবে। আজ শিব-চতুর্থীর ব্রত! আজ আমার হাতে মেঁহেদি মাখা। আজ ভগবানের কাছে স্বামীর দীর্ঘ আয়ু কামনা করেছি। আজ তাঁকে এমন খুশীর খবর দেবো, তিনিও খুশীতে নেচে উঠবেন। আজ আমি ভালো-মন্দ খাবার তৈরী করবো। উনি যে সব খাবার খেতে পছন্দ করেন—মশলা দেয়া ঢ্যাঁড়স আরবি তরকারী, মটর পোলাও, পকৌড়ি, দই বড়া, ডালের কচুরি, বেসনের নাড়ু। মনে মনে এইসব ভাবনায় ব্যস্ত সে, বে-খেয়ালে স্টোভে পাম্প করতে থাকে।

তার অবচেতন মনে সুদূরে এক চাপা ভাবনা ছিল—সবার ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার—যা দিয়ে অনায়াসে তাড়াতাড়ি উনুন ধরানো যায়, অথচ আমাদের

ঘরে সেই মান্ধাতা আমলের ভয়ঙ্কর স্টোভ কেন ?

হয়তো, এই প্রশ্নের জবাবে…হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পাম্প করার ফলে…হয়তো স্টোভের ধারে কাছে কেরোসিন তেলের বদলে স্পিরিট ছড়ানো থাকায়…হয়তো শান্তার নিজেরই ভুলে…হয়তো নিয়তির হাতছানি…হয়তো অন্য কোন কারণে…কিন্তু, বিরাট এক বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ছোট ছোট আগুনের শিখা, লেলিহান শিখা হয়ে দাঁড়ায়—মুহূর্তে শান্তার শরীরে জড়ানো নায়লন শাড়ি গোগ্রাসে গিলে ফেলে তাকে। সেই শাড়ি এমন ভাবে জ্বলতে থাকে, শান্তা যেন আপাদমস্তক একটা জ্বলন্ত মশাল হয়ে দাঁড়ায়। সে আর্তনাদ করে ওঠে…হয়তো সে চেঁচিয়েও থাকবে। সে দেখে, ধারে-কাছে ফ্ল্যাট থেকে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে।

জল আনো।

জল আনো।

কম্বল চাপা দাও।

শুধু চোখ দুটি ছাড়া আর কিছু অবশেষ নেই তখন। দেয়ালে টাঙানো ছগনলালের ছবির দিকে হাসিভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই চোখ। যেন বলে ওঠে—আমি তোমায় খুশীর খবরটুকুও দিতে পারলাম না গো। তারপর সেই চোখ দুটি আগুনের শিখায় ডুবে যায়। কম্বলে জড়ানো জ্বলন্ত মশাল, শান্তার মৃত শরীরে দাঁড়ায়।

ছগনলালের মা মন্দিরের পুজো সেরে ফিরে আসে, মাথা কুটতে থাকে—হায়, হায়, এ কি হলো! আমি সব কিছু খোয়ালাম। ছগনকে আমি মুখ দেখাবো কি করে ?

তারপর ছগনলালকে খবর দেয়া হয়, চোখে জল নিয়ে সে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ আগেই এসে পড়ে। লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য রওনা দেয়।

করোনার কোর্টে, স্টোভ ফেটে যাওয়ার দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর কারণ জানা যায়। কিন্তু, ডাক্তারের রিপোর্টে ছগনলাল জানতে পারে—মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল।

সেদিন থেকে ছগনলালকে কেউ আর হাসতে দেখে না।

সেদিন থেকে তাদের বাড়ীতে স্টোভে রান্না বন্ধ হয়ে পড়ে। পরদিনই ছগনলালের মা গ্যাস-সিলিণ্ডার ও উনুন আনিয়ে নেয়। সে জানে, ছগন-লালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কেরোসিন তেলের স্টোভে কখনও রাঁধবে না।

এবং সেই অভিশপ্ত স্টোভ; বেচারী শান্তার জীবন ছিনিয়ে নিয়েছিল, তুলে নিয়ে ছগনলাল বাইরে আঁস্তাকুঁড়েতে ফেলে দেয়।